

গৌৰিন্দকুমାର সংস্কৃত ଶ୍ରହାବଳୀ—୧

শାନ୍ତିଦେବ କ୍ରତ

ବୋଧିଚର୍ଯ୍ୟାବତାର

ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତା ନାମକ ନବମ ପାଠିଚ୍ଛେଦ

ପ୍ରଥମ ଭାଗ

ସମ୍ପାଦକ

ଶ୍ରୀଗୋପାଳଦାସ ଚୌଧୁରୀ

গোবিন্দকুমার সংস্কৃত গ্রন্থাবলী—১

শান্তিন্দেব কৃত
বোধিচর্যাবতার

প্রজ্ঞাপারমিতা নামক নবম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম্, এ, বি-এল
সম্পাদিত

শ্রীগোপেন্দ্রকুমার চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, কর্তৃক
প্রকাশিত

৩২নং বিডন রো, কলিকাতা

সন ১৩৪০, ইং ১৯৩৩

মূল্য ৥০ আট আনা

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগোপেন্দ্রকুমার চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্
৩২ বীডন রো, কলিকাতা ।

প্রিন্টার—শ্রীনন্দলাল শীল

অক্ষয় প্রেস

২৭।৫ তারক চাঁদুর্যের লেন, কলিকাতা

সম্প্রদায়ের নিবেদন ।

আমরা ভারতীয়গণ যে যে বিষয়ে অগ্ৰাণ্য দেশবাসী অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিকতর গৌরবান্বিত মনে করি তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষা অন্যতম, এবং উক্ত ভাষার মধ্য দিয়া যে ভাবধারা পবিত্র জাহ্নবীর ন্যায় মানব সভ্যতার প্রথম যুগ হইতে অগ্ৰাবধি অপ্রতিহত গতিতে বহমান হইয়া আসিতেছে তন্মধ্যে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র—আর্ষ ও বৌদ্ধ উভয়ই—আমাদের প্রধানতম গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই ।

সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের দুইটা দিক আছে—একটা হৃদয় শুদ্ধির ও সাধুতার দিক আর অন্যটি দর্শনের দিক বা বুঝা ও বুঝানার দিক । দর্শনের দিকেই মতভেদ । নিজের অবলম্বিত দর্শনকে সত্য ও সম্যক মনে করাই মনুষ্যের স্বভাব । মনুষ্য তাহার অন্যথা করিতে পারে না । কেহই নিজের মতকে অসত্য মনে করে না কারণ তাহা করিলেই তৎক্ষণাৎ সে তাহা ত্যাগ করিবে । কিন্তু এরূপ হইলেও আত্মোপমায় পরমতকে যথা সম্ভব মৈত্রী ও মুদিতার সহিত দেখাই যথার্থ উদারতা । সম্প্রদায়ের উপরে উঠা মনুষ্যের পক্ষে অস্বাভাবিক ও অকল্পনীয় (কারণ অসাম্প্রদায়িকতাও এক সম্প্রদায় বিশেষ) কিন্তু সংকীর্ণ সম্প্রদায়ভিমান সম্যক ত্যাজ্য । আর হৃদয়শুদ্ধি ও সাধুতার দিকে সর্বসম্প্রদায়ে প্রভূত ঐক্য আছে । উহা উন্মুক্ত আকাশের গায়, সর্বত্র গতিশীল বায়ুর গায়, স্তম্বিত চন্দ্রিকার গায়, সূর্যের প্রকাশের গায় ও মহার্ণবের গায় সকল দেশজ সকল সম্প্রদায়ের যৌথ সম্প্রতি ও সমান উপভোগের বস্তু । উদাহরণ স্বরূপ সাংখ্যযোগের মৈত্রী করুণাদি ভাবনু ও যমনিয়মরূপ শীল এবং “সর্ব পাপসু অকরণং কুসলসু উপসম্পদা । সচিন্তপরিম্বোদপনং এতং বুদ্ধান সাসনং” ধর্মপদস্থ

এই বুদ্ধোক্তি উদ্ধৃত হইতে পারে। ইহা যে সমস্ত সাধু সম্প্রদায়ের সম্মত ও আদরণীয় তাহা বলা বাহুল্য।

মনের এইরূপ বিশ্বাস লইয়া আমি বহুবৎসর পূর্বে আমার শিক্ষা গুরু শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ শ্রমণ মহাশয়ের মহানুভাবতা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করিয়া “গোবিন্দকুমার সিরিজ” নাম দিয়া কতকগুলি মূল্যবান পালিগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও মৌলিক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকাদি প্রচার করিয়া বৌদ্ধভাব সমূহের প্রসার ও বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত ছিলাম। কিন্তু বৌদ্ধ সাধারণের ও বঙ্গভাষার এবং বিশেষ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের ছুরদৃষ্টবশতই শ্রদ্ধেয় শ্রমণ মহোদয় অকালে মহাপ্রস্থান করায় আমার চেষ্টা ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। এই কারণেই প্রধানত পালি সিরিজের কোন পুস্তক আমরা বর্তমানে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আশা আছে অদূর ভবিষ্যতে আমরা কৃতকার্য হইতে পারিব।

আমার পিতৃদেব ৮গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয় বহু ভাষাবিদ এবং অশেষ পাণ্ডিত্যের আধার ছিলেন। তিনি একজন পরম বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন এবং যৌবনাবধি মৃত্যুকাল পর্যন্ত নক্তব্রতী থাকিয়া একান্ত ভাবে নির্জনে ধর্ম ও সাহিত্য চর্চা করিয়া মানবের চরম কাম্য পরাগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদিচ একাধারে কর্ম ও জ্ঞান-যোগীর দর্শনলাভ সুদুল্লভ কিন্তু আমার পিতৃদেব বস্তুতই একজন উচ্চ-শ্রেণীর কর্ম ও জ্ঞানযোগী ছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল এবং আমার বিশ্বাস সংস্কৃতভাষা তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তাঁহার অন্তরাখ্যার (আমরা হিন্দুমাতেই জীবের অবিদ্বন্দ্বিতার বিশ্বাসী) তৃপ্তিকল্পে “গোবিন্দকুমার সংস্কৃত সিরিজের” প্রথমগ্রন্থ বোধিচর্যাবতারস্থ প্রজ্ঞাপারমিতা সান্নুবাদ প্রকাশ করিলাম।

এই কার্য মোটেই সম্ভব হইত না যদি না ঋষিকল্প মনীষী পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীমৎ সাংখ্যযোগাচার্য হরিহরানন্দ আরণ্য মহাশয়ের আন্তরিক সহানুভূতি ও পূর্ণ সহায়তানাভে সক্ষম হইতাম। উক্ত আরণ্য মহাশয় কৃত প্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা এবং সহজবোধগম্য বঙ্গানুবাদ পাঠক মাত্রকেই মুগ্ধ করিবে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে।

আমাদের আশা আছে পূজনীয় আরণ্য মহাশয়ের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে এবং তাঁহার সহায়তানাভে সক্ষম হইলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা উভয়বিধ গোবিন্দকুমার সিরিজেরই কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারিব। আশা করি বর্তমান গ্রন্থ সাধারণের অতি প্রিয় ও আদরের বস্তু হইবে এবং আমাদের উদ্দেশ্যের সফলতা দেখিয়া কৃতার্থ হইব।

বুদ্ধপূর্ণিমা
১৩৪০ সাল }

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

সূচী ।

১ম ভূমিকা (বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি) (১)—(৩০)

ইহাতে পালিগ্রন্থ হইতে বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি যে সাংখ্যযোগ
তাহা দেখান হইয়াছে ।

২য় ভূমিকা—(নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্র্যবাদ) (৩০)—(৬৮)

ইহাতে অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, শান্তিদেব, শান্তরক্ষিত
প্রভৃতি সংস্কৃত বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতামত পরীক্ষিত
হইয়াছে ।

৩য় ভূমিকা—(শূন্যবাদ এবং বৌদ্ধ দর্শন ও আশ্র্য (৬৯)—(৮২)

ইহাতে পালি ও সংস্কৃত উভয় শাস্ত্র হইতে ঐ দুই
বিষয়ের বহুবিধ তথ্য বিচারিত হইয়াছে ।

প্রজ্ঞাপারমিতা

১—৫৮

অনুবাদের বিজ্ঞাপন

পালি বা শুদ্ধ মাগধী এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ সকলে যে নির্বাণধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার সহিত আর্য নির্বাণধর্মের কতদূর ঐক্য আছে এবং যে অল্পমাত্র ভেদ আছে (যাহা প্রধানত নামেরই ভেদ) তাহা ভূমিকাত্রেয়ে ও গ্রন্থমধ্যে সবিশেষ দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধ গ্রন্থসকল প্রাকৃত, ভাঙ্গা-সংস্কৃত ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। বৌদ্ধদের মূল প্রামাণ্য আগম সূত্র বা সূত্র নামে অভিহিত। সূত্রে শাস্ত্রপ্রণয়ন করা বহু প্রাচীন প্রথা। বৃহদারণ্যকে কয়েক স্থলে “সূত্রানি ব্যাখ্যানানি অনুব্যাখ্যানানি” এরূপ পাওয়া যায়। তাহাতে ধর্মসূত্র, গৃহসূত্র, দার্শনিক সূত্র প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থসকল প্রচলিত হয়। বৌদ্ধেরাও প্রাচীন প্রথাবলম্বনে সূত্রে শাস্ত্র-প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সূত্রগ্রন্থসকল অত্যধিক ক্ষীণ এবং পুনরুক্তি দূষিত। ঋষিদের সূত্র-ভাষ্য-টীকা সব লইয়াও বৌদ্ধদের সূত্র-পেক্ষা বোধ হয় সংক্ষিপ্ত ও সারবান্। হীনযানদের শাস্ত্র পালিতে লিখিত। কিন্তু বর্তমান পালিগ্রন্থসকল যে প্রাচীনতম তাহা না হইতে পারে। সিংহলী হইতে যে অনেক গ্রন্থ পালিতে অনূদিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়, আর কঠে কঠে বহু শত বৎসর থাকিয়া যে কত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মহাযানদের মূল গ্রন্থ ভাঙ্গা সংস্কৃতে (মাগধী ভাষায়) প্রথমে বোধ হয় ছিল, পরে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে প্রণীত হয়। পালিগ্রন্থ সকলে দার্শনিক বিশদতা অতি অল্পই আছে এবং তদগত গায়ও নিম্নশ্রেণীর। ব্রহ্মজাল শ্রামণ্যফল আদিতে পরমত খণ্ডন-করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন যেরূপভাবে করা হইয়াছে তাহা ঋষিদের গ্রন্থের তুলনায় অতি অবিশদ ও স্থূল গোছের। সংস্কৃত

বৌদ্ধগ্রন্থের যে গ্রন্থ তাহা তদপেক্ষা অনেক উন্নততর ও গৌতমের গ্রন্থের প্রতিদ্বন্দ্বী। গ্রন্থ ও দর্শন ব্যতীত আত্মরক্ষা করা কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব নহে, তজ্জন্ম বৌদ্ধেরাও নিজেদের অনুকূল গ্রন্থ ও গ্রন্থমূলক দর্শন প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাদৃশ গ্রন্থের মধ্যে দিঙ্নাগের গ্রন্থই প্রাচীনতম। তদপেক্ষা প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থশাস্ত্র ছিল বটে কিন্তু অধুনা বিলুপ্ত। পরে ধর্মাকীর্তি আদি উন্নততর গ্রন্থ দর্শন (গ্রন্থদর্শন শুদ্ধ logic নহে, উহা logic মূলক metaphysics বা আন্বীক্ষিকী) প্রণয়ন করেন। বৌদ্ধদের যে গ্রন্থ তাহা অনেক অংশে সংকীর্ণ প্রথানুগত (conventional) এবং উহার গণ্ডীর ভিতর ফেলিয়া তাঁহারা পরমত খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন। অসঙ্গত অনৈকান্তিক উদাহরণ, অন্ত্যব্যাপ্তি বা উদাহরণহীন ব্যাপ্তি, অপোহ বা কোন ভাব পদার্থ বলিলে উহা অভাবও কথিত হওয়া বা থাকা প্রভৃতিতে ফেলিয়া ফাঁকি বাহির করিয়া পরপক্ষ খণ্ডন ও স্বপক্ষ স্থাপন করার চেষ্টা প্রভূত দেখা যায়। পাঠক গ্রন্থমধ্যে তাহা দেখিতে পাইবেন।

বৌদ্ধদের প্রাচীন গ্রন্থে পদার্থের লক্ষণ গ্রন্থসঙ্গত প্রথায় মোটেই নাই। উহাতে কেবল সমার্থক কতকগুলি প্রতিশব্দ দিয়া লক্ষণ করা হইয়াছে, যেমন নির্বাণ = শূন্য, অনিমিত্ত, অসংস্কৃত, অভাব ইত্যাদি। পরের লেখকেরা অবশ্য প্রকৃত লক্ষণ (যাহা গ্রন্থ্য দর্শনের প্রধান অঙ্গ) দিয়াছেন। পালিতে বিশুদ্ধিমার্গে বুদ্ধঘোষ এবং নাগার্জুনাди সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা প্রকৃত ও গ্রন্থ্য লক্ষণ দিয়াছেন।

মাধ্যমিকেরা মায়াবাদী ছিলেন এবং নানা যুক্তি ও গ্রন্থের ফাঁকি দিয়া ঐ বাদ উপপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন। জগৎ শূন্যমূল এবং যাহা দেখা যায় তাহা যে মায়া ইহাই তাঁহাদের মত, পাঠক গ্রন্থমধ্যে সবিশেষ দেখিতে পাইবেন। জগৎ মায়ায় ইহা অতি প্রাচীন ও যথার্থ মত।

সাংখ্যেরাও উহা বলেন, কিন্তু শূন্যের উপর যে এই মায়া এবং মায়া যে কিছু নহে অথবা অনির্বাচ্য তাহা বলা সর্বথা অগ্ৰায্য ।

ঋষিমতের মায়াবাদী বেদান্তীরা যুক্তিবিষয়ে অবিকল পূর্ববর্তী মাধ্যমিকদের অনুকরণ করিয়াছেন। গোড়পাদ বোধ হয় উহার মূল উদ্ভাবয়িতা । তাঁহার কারিকায় অনেক বৌদ্ধশাস্ত্রস্থ শব্দ পাওয়া যায় । তবে শূন্যের পরিবর্তে আর্ষমায়াবাদীরা ব্রহ্মপদার্থ গ্রহণ করিয়াছেন । শঙ্করাচার্য্য প্রধানতঃ আগম বা বেদকে প্রমাণস্বরূপ করিয়া উহা স্থাপন করার চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থকারেরা (যেমন ভামতী কার বাচস্পতি খণ্ডন খণ্ড খাণ্ড কার শ্রীহর্ষ প্রভৃতির) ঐ দার্শনিক দোষ শুধরাইতে যাইয়া অবিকল বৌদ্ধদের যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন ।

মাধ্যমিকেরা মায়া (ও শূন্যকে) সৎও বলেন না অসৎও বলেন না । বেদান্তীরাও মায়াকে ‘সদসদ্যামনির্বাচ্যা’ বলেন । মাধ্যমিকদের যুক্তি এই যে সৎ ও অসৎ বিরুদ্ধ স্বভাব, তাহারা এক পদার্থে (বিকারী পদার্থে) থাকিতে পারে না অতএব বিকারী পদার্থ শূন্য । বেদান্তীরা (‘ভামতী’ দ্রষ্টব্য) ঠিক ঐ যুক্তিতে বলেন মায়া মিথ্যা (মিথ্যা অর্থে বৌদ্ধদের গ্ৰায় বেদান্তীরা বলেন—যাকে আছে বলিতে পারি না, নাই-ও বলিতে পারি না) । কেহ কেহ মিথ্যা অর্থে “নাই” করেন এবং ব্রহ্মই আছে জগৎ নাই—এরূপ মনে করার চেষ্টা করেন । অত্বেরা বলেন—জগৎ ঐরূপ মিথ্যা, ব্রহ্ম উহার বিপরীত বা সত্য । বলা বাহুল্য সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যা এই পদ সকলকে নিজেদের মনোমত অর্থে লক্ষিত করিয়া—উহাদের প্রসিদ্ধ অর্থ অপলাপিত করিয়া, এইরূপ অসঙ্গত বাদ স্থাপিত হয় । মায়া নাই বলা প্রলাপমাত্র, তাহাকে আছেও বলিব না নাইও বলিব না” এরূপ বলাও দর্শন নহে কিন্তু ‘অদর্শন ।’ তাহাকে “এককে অগ্ৰ জ্ঞান” এরূপ ভ্রান্তি বলাই প্রকৃত দর্শন । সেই “এক” ও ‘অগ্ৰ’ এই দুই পদার্থ থাকিলে তবেই উহা সঙ্গত বাদ হয় । সেই দুই পদার্থ দ্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্য ত্রিগুণ ।

দ্রষ্টাকে দৃশ্যবৎ মনে করা ভ্রান্তি এবং দৃশ্যকে দ্রষ্টা মনে করাও ভ্রান্তি, আর ত্রিগুণকে এই জগদ্রূপে দেখা যে মহা ইন্দ্রজাল বা মায়া তাহা বলাই বাহুল্য। সাংখ্য তাহাই বলেন। গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমুচ্ছতি। যত্নু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব স্তুতুচ্ছকম্ ॥ ইহাই সাংখ্যের সম্যক্ দর্শন। শূন্যবাদ এবং বৌদ্ধদর্শন ও আত্মা এই দুইটি পৃথক্ নিবন্ধ একত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া তৃতীয় ভূমিকায় দেওয়া হইয়াছে। ‘নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্র্যবাদ’ প্রবন্ধের কিয়দংশ মাত্র মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

শুদ্ধি ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(৯)	১৯	১৫।১৬	১।১৫-১৬
(১৮)	৯	ওল্খারিক	ওল্হারিক
(১৮)	১৪	পারিসী পুরিয়ার	পারিপূরিয়ার
(১৮)	১৭	এবং পরম	এবং
(২৫)	৪	ভঙ্গনবাদ	ভঙ্গ বাদ
(২৬)	৯	নির্মাণ ।	নির্মাণ-
(৩২)	৫	বুদ্ধৈরাশ্রা	বুদ্ধৈর্নাশ্রা
(৩৩)	৮	তিষ্ঠেদাপাক	তিষ্ঠতাপাক
৩৩)	৯	তং	সং
(৪২)	২৫	নিত্যবাদবহীরতে	নিত্যত্বমবহীরতে
(৪৮)	১৭	অক্ষ্যার্থা	অক্ষ্যার্থা
(৫৪)	৮	নৈকজাত্যস্থিত্যং	নৈকজাত্যস্থিতং
(৬২)	৯	বৈশ্ব	বৈশ্ব
(৬৯)	৯	ভাবতা	ভাবনা

শান্তিদেব কৃত বোধিচর্যাবতারের নবম পরিচ্ছেদ

শ্রদ্ধা পারমিতা

ভূমিকা

১ : বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি (পানি হইতে) :

(১৩১৪ সালের 'হিন্দু পত্রিকা'য় প্রকাশিত)

ভারতই মোক্ষ বা নির্বাণ ধর্মের জন্মভূমি। যে অবস্থায় দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিরুত্তি হয় সেই ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত অবস্থাকে নির্বাণ-মুক্তি কহে। নির্বাণসাধক আচরণসমূহ নির্বাণধর্ম। নির্বাণ ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত অবস্থা বলিয়া ইন্দ্রিয় ও মনকে সম্যক্ নিরুদ্ধ করাই নির্বাণ-ধর্মসমূহের শেষ ফল। সমাধি এবং ঐন্দ্রিয়িক ও মানস বিষয়ে সম্যক্ বৈরাগ্যই ইন্দ্রিয় ও মনকে সম্যক্ নিরোধ করার উপায়। সুতরাং সম্যক্ সমাধি ও সম্যক্ বৈরাগ্য (যোগশাস্ত্রের ভাষায় নিরোধসমাধি ও পর-বৈরাগ্য), নির্বাণের মুখ্য ও সাধারণ উপায়।

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের কচিৎ কচিৎ এবং প্রধানত উপনিষদে নির্বাণধর্মের উপদেশ দেখা যায়। তদ্যতীত বেদের অনুগত সাংখ্য ও বেদান্ত (শাক্তর) শাস্ত্রে নির্বাণের উপদেশ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রেও উহা পাওয়া যায়।

সমাধি ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে সাংখ্যাদি আর্ষশাস্ত্রে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে বেরূপ নির্বাণধর্মের বিধি আছে, তাহা যে বস্তুত এক তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

(২)

প্রজ্ঞা পারমিতা

১ **আশ্রমশাস্ত্র** : তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশৃণুমিব সমাধিঃ । যোগসূত্র । অর্থাৎ ধ্যান বা চিত্তের একতানতা পরিপুষ্ট হইয়া যখন কেবল ধ্যের বিষয়মাত্রই বোধগোচর থাকে, আত্মহারার ঞায় সেই ধ্যানই সমাধি ।

২ **বৌদ্ধশাস্ত্র** : কুসলচিত্তেকগ্গতা সমাধি । অবিক্বেপলক্খণং । অবিকম্পনং । বিসুদ্ধি মগ্গো, ৩ অঃ । অর্থাৎ কুশল চিত্তের একাগ্রতা যাহা অবিক্বেপলক্ষণ ও অবিকম্পন তাহাই সমাধি ।

২ **আঃ** : সমাধি ফলভেদে দুই প্রকার—বিভূতিমাত্র ফল ও কৈবল্য ফল । তন্মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত বোগ কৈবল্যফল আর কৈবল্য বিষয়ে অপ্রযুক্ত, সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা অননুবিদ্ধ সমাধিই বিভূতিমাত্র ফল ।

২ **বৌঃ** : বৌদ্ধদের সমাধিও গতিভেদে দ্বিবিধ—লৌকীয় ও লোকোত্তর । তন্মধ্যে 'তিসু ভুমিসু কুসলচিত্তেকগ্গতা লৌকীয়ো সমাধি । অরিয়মগ্গ সম্পযুত্তা লোকুত্তরো সমাধি ।' বিসুদ্ধি, ৩ অঃ । অর্থাৎ বামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর এই তিন ভূমিতে লৌকীয় সমাধি হয় আর আৰ্য্যমার্গের সহগত সমাধি লোকোত্তর । বৌদ্ধদেরও লৌকীয় সমাধির ফল সিদ্ধি বা দেহহুপ্রাপ্তি ব্যতীত আর কিছু নহে ।

৩ **আঃ** : নির্ঝাণের উপায় সংগ্রহ যথা “শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধি-প্রজ্ঞাপৃষকমিতরেযাং ।” যোগসূত্র । অর্থাৎ শ্রদ্ধা হইতে বীর্য্য, বীর্য্য হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে সমাধি ও সমাধি হইতে বোগজা প্রজ্ঞা এই উপায়ের দ্বারাই কৈবল্য হয় ।

৩ **বৌঃ** : “সদ্ধায় সীলেন চ বীরিয়েণ চ সমাধিনা ধম্মবিনিচ্চয়েন চ” ইত্যাদি । ধম্মপদ ১০।১৬ । অর্থাৎ শ্রদ্ধা, শীল, বীর্য্য, সমাধি, ধম্ম-বিনিশ্চয় এবং বিদ্যাচরণসম্পন্ন ও স্মৃত্যুক্ত হইয়া ছুঃখবিয়োগ লাভ করিবে । বৌদ্ধদের শীল, যোগীদের যম ও নিয়ম ছাড়া আর কিছু নহে । নিয়মের মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধান আছে । বৌদ্ধদের তাহা না থাকিলেও বুদ্ধানুস্মৃতি আছে । যোগীদের ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ । বুদ্ধানুস্মৃতিও মুক্ত

পুরুষের প্রণিধান। ‘বীতরাণবিষয়ং বা চিত্তং’ এই যোগসূত্রানুসারে বুদ্ধ-প্রণিধানও যোগশাস্ত্রসম্মত। স্মৃতি একটি প্রধান সমাধিসাধন বৌদ্ধের ধর্মাবিশিষ্ট এবং বিজ্ঞা যোগের প্রজ্ঞা। সমাধির ফল যে প্রজ্ঞা তাহা বুদ্ধঘোষও বলেন, যথা, বিস্কন্ধি মগ্গো ১৪ অঃ “সমাধিতো যথাভূতং পজ্ঞানাতি পস্‌সতীতি বচনতো পন সমাধি তস্‌সা (পঞ্‌ঞয়) পদট্ঠানং *।”

৪ অঃ ১। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই চারি পদার্থের অনুগমভেদে সর্বাঙ্গ সমাধি চারি প্রকার। ‘যথা—বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতা-রূপানুগমাং সম্প্রজ্ঞাতঃ’। যোগসূত্র। “তত্র প্রথমঃ চতুষ্টিয়ানুগতঃ সমাধিঃ সর্বিতর্কঃ। দ্বিতীয়ো বিতর্কবিকলঃ সবিচারঃ। তৃতীয়ো বিচারবিকলঃ সানন্দঃ চতুর্থ স্তদ্বিকলোহস্মিতামাত্র ইতি’। যোগভাষা। অর্থাৎ সর্বিতর্ক বিতর্কাদি চারি ভাবের অনুগত। সবিচার বিতর্ক-রহিত। সানন্দ বিচার-রহিত। সাস্মিত ঐ সব ও আনন্দ রহিত। সানন্দ সমাধি আনন্দানুভব-বিসয়ক সূত্রনাং আধ্যাত্মিক। ইহাতে হৃদয়মূলা সর্বব্যাপী সাত্ত্বিকতা বা সুখ অনুভূত হয়। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন “নির্বিচার-বৈশারত্তোহধ্যাত্মপ্রসাদঃ।”

* পাশ্চাত্য মতে বৌদ্ধশাস্ত্রাপেক্ষা যে সব প্রাচীন উপনিষদ আছে তন্মধ্যে ছান্দোগ্য একটি। তাহাতে আছে “আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ক্রবাস্মৃতিঃ স্মৃতিলন্তে সর্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষঃ”। বৌদ্ধেরাও বলেন “একমনো অয়ংভিক্‌থবে মগ্গো সত্ত্বানং বিস্কন্ধিয়া * * যদিদং চত্তারো সতিপট্ঠানো।” মজ্জিম নিকায়ে সতিপট্ঠান সূত্রং। অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ এই যে চারিটা স্মৃতি প্রস্থান ইহারা প্রাণীদের বিস্কন্ধির জন্ম একমাত্র উপায়। অতএব এই প্রধান স্মৃতিরূপ সাধন যে বৌদ্ধেরা প্রাচীন উপনিষদ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সংশয় নাই।

অধ্যাত্ম ভাবের চরম সীমা অস্মি বা আমিমাত্র বোধ এই আমিত্ব-মাত্র-বিষয়ক সমাধিই যোগের সান্মিত সমাধি। অনাত্ম বোধের অর্থাৎ ব্যবহারিক আত্মবোধের ইহা চরমসীমা। পঞ্চশিখাচার্য্য বলেন “তমগ্-মাত্রমাত্মানম্ অনুবিদ্যাস্মীতি এবং তাবৎ সম্প্রজানীতে।”

৪ বোঃ : ‘সো বিবিচ্ছেব কামেহি বিবিচ্ছেব অকুসলেহি ধম্মেহি সবিতক্কং সবিচারং বিনেকজং পীতিসুখং পঠমং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি।’ পোট্ঠপাদ সূত্রং। অর্থাৎ কাম ও অকুশল ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ বা বিবিক্ততাজনিত (ধ্যেয়ে তন্ময় হইয়া) প্রীতি সুখযুক্ত ধ্যানই প্রথম।

বৌদ্ধদের দ্বিতীয় ধ্যান “বিতর্কবিচার-রহিত আধ্যাত্মিক ‘একোদি ভাব’ বা একতানতা সহগত প্রীতিসুখ স্বরূপ”। (হংসাবতী) ধর্ম্ম সঙ্কনি, ২৮ পৃঃ। এই দ্বিতীয় নির্বিচার ধ্যানও, ‘অজ্জ্বাত্তং সম্পসাদন’-লক্ষণে লক্ষিত (যোগের অধ্যাত্মপ্রসাদের গ্ৰায়)।

তৃতীয় ধ্যান প্রীতিশূন্য বা চিন্তাগত-হ্লাদশূন্য। তাহাতে “সুখং কায়েন পাটসম্বেদেতি” অর্থাৎ কায় বা ইন্দ্রিয়গত (করণগত) হ্লাদযুক্ত।

বৌদ্ধদের চতুর্থ ধ্যান সংজ্ঞা-বিষয়ক, যথা, ‘ততো খো পোট্ঠপাদ ভিক্খু ইধ সকসএঃঞী হোতি সো ততো অমূত্র ততো অমূত্র অনুপূবেন সএঃঞগং ফুসতি।’ সীলকথকের পোট্ঠপাদ সূত্রং। অর্থাৎ হে পোট্ঠপাদ, তদনন্তর ভিক্ষু স্বকসংজ্ঞী (স্ব বা আত্ম-সংজ্ঞী) হইতে থাকেন ও পরে ‘ইহা হইতে পৃথক্’ ‘ইহা হইতে পৃথক্’ (উপনিষদের ‘নেতি নেতি’) এইরূপ ক্রমে সংজ্ঞার (সাধারণ আত্মসংজ্ঞার) অগ্র বা সীমা স্পর্শ করেন। ইহাই যোগের অস্মীতিমাত্র সান্মিত সমাধি।

যোগশাস্ত্রের সবিতর্ক-সবিচারাদি সমাধির গ্ৰায় বৌদ্ধদেরও বিভাগ আছে। অথসালিনীর চিত্তুপ্পাদ কণ্ঠে ধ্যানের পঞ্চক নয় দ্রষ্টব্য।

৫ আঃ : সম্প্রজ্ঞাত যোগই কৈবল্যের সাক্ষাৎ উপায়। সবিতর্কাদি

সমাধিজাত প্রজ্ঞা চিত্তের সম্যক্ নিরোধে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। যথা, 'যন্ত একাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রচোতয়তি ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্ কস্ম্যবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি স সম্প্রজ্ঞাতো যোগঃ।' যোগভাষ্য ১।১। অর্থাৎ একাগ্রভূমিকায় উৎপন্ন যে সমাধি যাহা (১) যথাভূত বিষয় প্রকাশ করে, (২) ক্লেশ ক্ষয় করে, (৩) কস্ম্য বন্ধন বিশ্লথ করে, এবং (৪) নিরোধকে অভিমুখ করে তাহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ, তাহার নিষ্ঠা সপ্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। সেই প্রান্তপ্রজ্ঞা এবং পরবৈরাগ্য পূর্বক সম্যক্ নিরোধ হইলে তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে। তাহারই ফল কৈবল্য বা নির্বাণমুক্তি। যে প্রজ্ঞায় জ্ঞাতব্য, ক্ষেতব্য ও হাতব্য শেষ হয় ও যৎপরে আর জ্ঞাতব্য, ক্ষেতব্য ও হাতব্য থাকে না তাহাই প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। ফলত যোগশাস্ত্রের সম্প্রজ্ঞাত যোগে—(ক) যথাভূত প্রজ্ঞা হয় ; (খ) অবিद्या, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ ক্লেশ ক্ষয় পায় ; (গ) কস্ম্যবন্ধন বা সংস্কার ক্ষীণ হয় ; (ঘ) অবিद्याদিরা প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার ও পর-বৈরাগ্যের দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হয়।

৮ বোধঃ লোকুত্তর মার্গ নির্বাণের সাক্ষাৎ উপায়। তাহা চারি অবস্থায় বিভক্ত। তাহার। সকলেই 'নির্য্যানিক' বা বন্ধনচ্ছেদ করিয়া উদ্ধগতিশীল ; 'অপচয়গামী' বা সংস্কারক্ষয়কারী সমাধি। তাহার প্রথম ভূমিতে 'অঞ্ঞাত এঞ্জ্ঞস্ সামীতিদ্রিয়ং' অর্থাৎ অজ্ঞাত জানিব— এইরূপ ইন্দ্রিয়শক্তি নিশ্চয় হয়। এবং তাহার। দিট্ঠিগতানং বা অযথা-জ্ঞানের প্রহাণকারী। দ্বিতীয় ভূমিতে কামরাগ এবং ব্যাপাদ বা হিংসার তনুভাব বা ক্ষীণতা হয়। তৃতীয় ভূমিতে কামরাগ ও ব্যাপাদের অনবশেষ প্রহাণ বা সমূলঘাতে নাশ হয়। চতুর্থ ভূমিতে রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, উদ্ধচ্চ (উদ্ধত্য বা চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা) ও অবিद्याর অনবশেষ প্রহাণ হয়। ইহাতে 'অঞ্ঞিদ্রিয়' অর্থাৎ জ্ঞাত , প্রাপ্ত, বিদিত সমস্ত ধর্মের সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা হয়, (বিশেষ ধর্মসঙ্গনি ১।৫ দ্রষ্টব্য)। অতএব

(৬)

প্রজ্ঞা পারমিতা

বৌদ্ধশাস্ত্রের লোকুত্তর মার্গেও (ক) প্রজ্ঞা বা আজ্ঞা হয়। (খ) অবিद्या, ত্রিবিধ রাগ, ব্যাপাদ (দ্বेष), অভিমান (অস্মিতা) এবং বিক্ষিপ ক্ষয় হয়। (গ) সংস্কার ক্ষয় হয় এবং বন্ধন ভেদ হয়। (ঘ) উহাদের অনবশেষ প্রহাণ হয়। ফলত উপযুক্ত ঋষিমতের সহিত এ বিষয়ে বৌদ্ধমত বস্তুত একই হইল।

৬ আঃ। সম্প্রজ্ঞাতযোগ সম্যাগাচরিত হইলে, নিরোধভূমিক অসম্প্রজ্ঞাতযোগ হয়। অসম্প্রজ্ঞাতযোগ সিদ্ধ হইলে ইহজীবনেই বিদেহকৈবল্য লাভ হয়।

৬ বোঃ। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না তবে তাহাদের 'সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ' সমাধি, যোগের নিরোধ সমাধির অনেক নিকট ও বোধ হয় একই। কিঞ্চিৎ "আকাশে বসকুস্তানং গতি তেসং ছরন্নয়া"। 'সুত্রং গাগার পবিষ্টসুস'। অর্থাৎ অর্হৎদের গতি আকাশে পক্ষীর গতির ন্যায় ছলক্ষ্য, শূন্যাগারে প্রবিষ্ট ইত্যাদি বচন হইতে উহা অনুমিত হয়। ফলে যে-চিত্ত সম্যক্ রাগশূন্য এবং সংজ্ঞাবেদয়িতারও নিরোধে অনুরক্ত-তাদ্শ চিত্ত সমাহিত থাকিলে শেষে যোগের নিরোধ সমাধিতেই যাইবে। বৌদ্ধদের উপদিসেস নিৰ্বাণ এবং অনুপদিসেস নিৰ্বাণ এই দুইয়ের মধ্যে প্রথম অবস্থা ঠিক যোগের জীবনমুক্তি এবং দ্বিতীয়টি বিদেহ মুক্তি। সংজ্ঞাবেদয়িতা = সংস্কার বেদয়িতা ; সংজ্ঞা = প্রাথমিক নাগাদিহীন বোধ = সাংখ্যের আলোচন জ্ঞান।

৭ আঃ। যোগমতে প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি এবং অতিক্রান্ত-ভাবনীয় যোগীদের এই চতুর্বিধ অবস্থা আছে। অতিক্রান্ত-ভাবনীয়স্থ প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞাসম্পন্ন যোগীরাই সাক্ষাৎ কৈবল্য লাভ করেন। অত্বেরা দেহপাতে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পরে মুক্ত হন।

(ক) সাংখ্য-যোগ মতে প্রজ্ঞার অন্ততম প্রধান বিষয়—হেয় বা

১। ভূমিকা (বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি) (৭)

অনাগত ছুঃখ, হেয়হেতু বা ছুঃখহেতু, হান বা মোক্ষাবস্থা এবং হানোপায় বা যোগ।

(খ) সমাধির দ্বারা সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতা হয়।

৭ বোঃ। বৌদ্ধদের লোকোত্তরমার্গসূত্রেরও চারি ভেদ আছে ; যথা শ্রোতআপন্ন, সঙ্কদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ। অর্হতেরাই পরিনির্বাণ (বিদেহমুক্তি) লাভ করেন, অথোরা ব্রহ্মলোকে বা উচ্চ স্বর্গে গমন করেন ও পরে মুক্ত হন।

(ক) বৌদ্ধমতেও সম্যক্ দৃষ্টির বিষয় চারিটি যথা ছুঃখ, ছুঃখহেতু ছুঃখনিরোধ ও ছুঃখনিরোধের পথ। মার্গবিভঙ্গ সূত্র দ্রষ্টব্য।

(খ) সমাধির দ্বারা বৌদ্ধমতেও ইন্ধি বা ঋদ্ধি অর্থাৎ অলৌকিক ক্ষমতা লাভ হয়।

৮ আঃ। সাংখ্যাদি মতে অবিজ্ঞাই বন্ধনের মূল। তাহার আদি নাই।

৮ বোঃ। অবিজ্ঞা মূল সংযোজন (বন্ধন) ও মূল আসব। অখসালিনীতে উদ্ধৃত বুদ্ধ বচন হইতে জানা যায় যে অবিজ্ঞার আদি বা যাহার পূর্বে অবিজ্ঞা ছিল না তাহা জানা যায় না।

৯ আঃ। “যে চৈতে মৈত্র্যাদয়ঃ ধ্যানিনাং বিহারাঃ” যোগভাষ্যে উদ্ধৃত এই প্রাচীন সাংখ্যাচার্যের বচনে জানা যায় যে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটা ধ্যায়ীদের বিহার।

৯ বোঃ। মৈত্রী আদিকে বৌদ্ধেরা ব্রহ্ম-বিহার বলেন। সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে উহা প্রাচীন সাধন। *

১০ আঃ। ধর্মার্চ্য্যা দ্বিবিধ বাহু ও আধ্যাত্মিক। “বাহুং স্ততি-

* যদিচ নিকায়-জাতকাদি সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থের মতে ব্রহ্মবিহার (এই নামই ইহার অবৌদ্ধ উদ্ভব সূচিত করিতেছে) বুদ্ধের পূর্বকাল হইতে আছে তথাপি Rhys Davids উহা বৌদ্ধদের উদ্ভাবিত বলিতে চান।

(৮)

প্রজ্ঞা পারমিতা

দানাভিবাদনাদি চিত্তমাত্রাধীনং শ্রদ্ধাছাধ্যাত্মিকং...তয়ো মর্নসং বলীয়ঃ”
যোগভাষ্য ৪।১১। “পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।” গীতা

তিনি আরও বলেন “But they have not been found in any Indian book that is not a buddhist work and therefore almost certainly exclusively buddhist” কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। উদ্ধৃত সাংখ্যাচার্যের বচন ও যোগসূত্রস্থ ঐ সাধন তাহার প্রমাণ।

এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কয়েকটি উদ্ভট তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পূর্বে ধ্যান ছিল বটে কিন্তু সমাধি বৌদ্ধদের আবিষ্কার। তাহার মতে “Samadhi has not yet been found in any Indian book older than the Pitakas.” অথচ তিনি বৃহদারণ্যককে বুদ্ধাপেক্ষা প্রাচীন বলেন। তাহাতে আছে ‘সমাহিতো ভূত্বা’ ইত্যাদি। প্রকৃতপ্রস্তাবে কঠ মুণ্ডক আদি উপনিষদের ভাষা বৌদ্ধদের ধর্মপদের ভাষা অপেক্ষা যে বহু প্রাচীন তাহা ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই বুঝিতে পারেন (ডাঃ বেঙ্কলকার কঠ আদিকে বুদ্ধাপেক্ষা বহু প্রাচীন বলিয়াছেন। প্রকাশক)। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যদের কোনই নিশ্চারক যুক্তি নাই কেবল অবিশ্বাস ও অন্ধকারে ঢিল মারা মাত্র আছে। অবিশ্বাস মাত্রের দ্বারা কিছু প্রমাণ হয় না। যেরূপ ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছে তাহা গ্রহণ করাই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে সমীচীন পন্থা, যতদিন না প্রকৃত যুক্তির দ্বারা তাহার অশ্রুত প্রমাণিত হয়।

ধ্যান ও সমাধি নিব্বিশেষে বৌদ্ধ ও আর্ষ শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মজালসূত্রে শাশ্বতবাদীদের ধ্যানকে সমাধিপদের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং মার্গবিভঙ্গ-সূত্রেও বৌদ্ধদের চারিধ্যানকে সমাধি বলা হইয়াছে, যথা, ‘চতুখং ঝানং উপসম্পজ্জ’ বিহরতি অয়ং বুচ্ছতি সম্মা সমাধি।’ প্রগাঢ়তম ধ্যানই সমাধি।

১। ভূমিকা (বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি) (৯)

১০ বোঃ। এই সাংখ্যীয় তত্ত্বটী (মানস ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব) বৌদ্ধ-ধর্মেরও মূল তত্ত্ব। বস্তুতঃ চিন্তামাত্রাধীন ধর্মার্চ্যার বহুল প্রচার করাই বৌদ্ধদের বিশিষ্টতা। তবে বাহু ধর্মও তাঁহাদের সম্যক্ ত্যাজ্য নহে, যথা, প্রজ্ঞাপারমিতায় “পুষ্প-ধূপ-মালা-বিলেপন-চূণ-চীবর-ছত্র-ধ্বজ-ঘণ্টা-পতাকাভিঃ সুবর্ণরৌপ্যমরৈশ্চ পুষ্পৈ দিবৈশ্চ বাঐঃ” ইত্যাদি বচনে বাহু পূজার বিধি দেখা যায় (৩০ বিবর্ত)।

১১ আঃ। সাংখ্যমতে জগতের মূল উপাদান ও হেতু ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে, কিন্তু অনাদি। জগৎ অনাদি কারণকার্য্য-পরম্পরা মাত্র। কিঞ্চিৎ অনাদিমুক্ত ঈশ্বর ও হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি স্বীকৃত আছে।

১১ বোঃ। বৌদ্ধশাস্ত্রেও জগতের উপাদান সর্কর্তৃক নহে। কিঞ্চিৎ উদীচ্য বা মহাযানেরা অনাদিমুক্ত আদিবুদ্ধ এবং অবলোকিতেশ্বর আদি জগৎপাতা স্বীকার করেন। আর উদীচ্য বা যাম্য দুইমতেই ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি স্বীকৃত আছে। (অগ্রে দ্রষ্টব্য)

১২ আঃ। পাপের দ্বারা নিরয়ে ও পুণ্যকর্মের দ্বারা স্বর্গে গমন হয় এবং প্রেতের উপকারার্থ দানাদি করা কর্তব্য। ইহা প্রাচীন ঋষিমত।

১২ বোঃ। বৌদ্ধেরাও ইহা স্বীকার করেন। ‘পাপকৃদ্ উভয়ত্রৈব ইহ প্রেত্য চ শোচতি। পুণ্যকৃদ্ভয়ত্রৈব ইহ প্রেত্য চ মোদতে’ ॥ ধর্মপদ ১৫।১৬। ‘এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।’ তিরোকুড্য সূত্রং। অর্থাৎ এইরূপে ইহলোকে দান করিলে প্রেতদের উপকারক হয়।

আর্ষদের ঞ্চার পুণ্য ও পাপ কর্ম হইতে মৃত্যুর পর দিব্য ও নারক শরীর গ্রহণ হয় ইহা বৌদ্ধমতেরও অঙ্গ, যথা, “যে কেচি বুদ্ধং সরণং গতাসে ন তে গমিস্সন্তি অপায়ং। পহার মানুসং কায়ং দেবকায়ং পরিপুরেস্সন্তীতি ॥” মহা সময়সূত্রং।

এই তালিকা হইতে পাঠক দেখিবেন যে তত্ত্বতঃ বৌদ্ধ ধর্ম ও

আর্যধর্ম এক। তাহাদের সাদৃশ্য ও একত্ব আরও অনেক দেখান যাইতে পারে, কিন্তু বাহ্যল্যভয়ে দেখান হইল না। অবশ্য বুঝাইবার প্রণালী, পদার্থের গুণ প্রভৃতি সামান্য বিষয়ে বহু ভেদ আছে, কিন্তু মূল ধর্মতত্ত্বে কিছু ভেদ নাই। ফলে প্রাচীন সাংখ্য ও যোগের উপর প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম স্থাপিত।

কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধপক্ষীয়েরা ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—“শীল, স্মৃতি, ব্রহ্মবিহার, সমাধি (চারি ধ্যান), রূপাবচর ধ্যান, অরূপ ধ্যান, ইহা সব বুদ্ধ অপেক্ষা প্রাচীন বটে (কারণ সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রের তাহাই তাৎপর্য) * কিন্তু লোকোত্তর মার্গ বুদ্ধদেবের নিজের আবিষ্কার, তিনিই উহার আদি শাস্ত্র। আর্য শাস্ত্রে নির্বাণের কথা নাই। তাহার মুক্তি ব্রহ্মলোকে গমন পর্য্যন্ত।” এ বিষয়ে বৌদ্ধদের যুক্তি এইরূপ—

(ক) লোকনাথ বুদ্ধ বলিয়াছেন “ইমে খোতে ভিক্খবে ধম্মা, গন্তীরা, ছন্দসসা, ছরনুবোধা, সন্তা, পনীতা, অতক্কাবচরা, নিপুণা, পণ্ডিতবেদনীয়া, যে তথাগতো সয়ং অভিসঞ্ঞায় সচ্ছিকত্ত্বা পবেদেতি। (ব্রহ্মজাল সূত্রং)। অর্থাৎ হে ভিক্খুগণ ! এই যে ধর্ম সকল (লোকোত্তর) ইহারা গন্তীর, ছন্দর্শ, ছরনুবোধ, শাস্ত্র, পনীত বা পূর্ণ (প্রণীত), তর্কমাত্রের অগোচর, নিপুণ বা স্কন্ধ ও পণ্ডিতবেদনীয়। তথাগত ইহা স্বয়ং

* Rhys Davids সাহেবও ইহা স্বীকার করিয়াছেন,—যথা,—
Now it is perfectly true that of these thirteen (অর্থাৎ শীল সমাধি আদি হইতে লোকোত্তর মার্গ পর্য্যন্ত) consecutive propositions or groups of propositions, it is only the last, that is No, 13 (অর্থাৎ লোকোত্তর মার্গ) that is exclusively Buddhist.—Dialogues of the Buddha.

অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া প্রবেদন বা উপদেশ করিতেছেন। অতএব বুদ্ধই “লোকুত্তর” ধর্মের আবিষ্কর্তা।

(খ) বৌদ্ধদের ‘শীলব্রত পরামাস’ নামক সংযোজন বা বন্ধনের বিবরণে আছে, “ইতো বহিদ্ধা সমন ব্রাহ্মণানং” ইত্যাদি। (ধর্ম সঙ্গনি। নিক্খেপ কণ্ড)। অর্থাৎ এই শাস্ত্রের (বৌদ্ধ শাস্ত্রের) বাহিরে যে শীল ব্রতের দ্বারা শুদ্ধি ইত্যাদি তাহাই উক্ত বন্ধন। অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রের বহির্ভূত অন্তঃশাস্ত্রের দ্বারা বন্ধনমোচন হয় না। অর্থাৎ তাহাতে নির্বাণের প্রকৃত মার্গ নাই।

(গ) বৌদ্ধশাস্ত্রে সাংখ্যযোগিগণের উল্লেখ নাই। যদি তাঁহারা পারদর্শী হইতেন, তবে অবশ্য উল্লেখ থাকিত।

এই সকল যুক্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে—আর্যশাস্ত্রের মোক্ষ যে ব্রহ্মলোকে গমন পর্য্যন্ত, লোকাতীত নির্বাণ মুক্তি যে আর্যশাস্ত্রে নাই, এই দৃষ্টি যে অজ্ঞতামাত্র পূর্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৌদ্ধদের প্রথম যুক্তিতে যে ‘তথাগত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ করিতেছেন’ এই বাক্য আছে তন্মধ্যস্থ ‘স্বয়ং’ শব্দের অর্থে কেবল তথাগতই উহার আবিষ্কর্তা—এরূপ নহে। উহার অর্থ—তথাগত নিজে সাক্ষাৎ করিয়া বলিতেছেন, শুনিয়া বা অনুভব না-করিয়া বলেন নাই।

বৌদ্ধদের ‘দিট্ঠুপাদান’ (মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করিয়া থাকা) নামক দোষের বিবরণে আছে “নখি লোকে সমনব্রাহ্মণা যে সমগ্গতা পটিপন্না। যে ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সয়ং অভিঞ্ণয় সচ্ছিক্তা পবেদেত্তীতি।” (ধর্ম সঙ্গনি। উপাদান গোচ্ছকং)। এস্থলে ‘সয়ং’-শব্দের অর্থ ঠিক উপরের ঠায়। বিশেষত কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যে সর্বোচ্চ পদ লাভ করিয়া তদ্বিষয়ে উপদেশ করেন নাই এরূপ মনে করা একটা ছুট মত। এই ছুট মত (দিট্ঠুপাদান) অবশ্য বুদ্ধদেবের

ছিল না, অর্থাৎ তিনি অবশ্যই পারদর্শী সমন-ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন ও তাঁহাদিগের উপর শ্রদ্ধাবান ছিলেন ।

বৌদ্ধপন্থের তৃতীয় যুক্তিতে বক্তব্য এই যে—নির্ঝাণধর্ম যে পূর্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল, এই বিশ্বাসে সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুপ্রাণিত । বৌদ্ধ-শাস্ত্রের সর্বত্রই কতকগুলি সাধারণ বাক্য পাওয়া যায় । সেই সমস্ত সাধারণ বাক্য (Stock passages) সর্বত্রই উদ্ধৃত দেখা যাওয়াতে—তাহা অতি প্রাচীন এবং বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে । তাঁহাদের—তৃতীয় ধ্যানের লক্ষণে আছে ‘যত্তং অরিয়া আচিক্খন্তি উপেক্খকে। সতিমা সুখবিহারীতি’ । অর্থাৎ ধ্যান-বিষয়ে আর্যেরা বলেন ‘উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী’ । ইহা এক সাধারণ বাক্য । এই বাক্যস্থ আর্যেরা কে ? বুদ্ধদেব কোন্ আর্যদের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন ? অবশ্যই তৎপূর্বেকার যোগাচার্যদের বাক্য । তাঁহাদেরই বুদ্ধদেব আর্য বা পারদর্শী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । (‘কতমো পুগ্গলো অরিয়া ? অট্ঠারিয় পুগ্গলো অরিয়া, অবসেসো পুগ্গলো অনরিয়া’ । পুগ্গল পঞ্ঞন্তি, এককং । অর্থাৎ বুদ্ধ-প্রত্যেকবুদ্ধাদি অষ্ট প্রকার পুরুষই আর্য) । ঐ ধ্যান-চর্চা যে পূর্ব হইতেই ছিল, বুদ্ধের শিক্ষক অড়ার-কালাম (যাহাকে অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে সাংখ্যানতাবলম্বী বলিয়াছেন) তিনি যে ঐ সব ধ্যানে পারদর্শী ছিলেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে । মজ্জিম নিকায়, অখসালিনী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য । ইহাতে কোন কোন বৌদ্ধেরা বলিবেন যে উহা পূর্বতন বুদ্ধদের উক্তি অনুসারে বলা হইয়াছে । কিন্তু ইংরাজী বচনে বলিলে ‘That is looking too far back’ কারণ পূর্ব-বর্তীকৃষ্ণপ বুদ্ধের ২০,০০০ বৎসর পরমায়ু ছিল । তাঁহার ধর্ম ৭০,০০০ বৎসর বর্তমান ছিল, পরে লোপ হইবার বহু বহু সহস্র বৎসর পরে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয় ।

প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধের কথাবার্তা বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ—তাদৃশ অধিকাংশ

বৌদ্ধশাস্ত্রই তাঁহার অনেক পরে রচিত। যেমন 'ব্রহ্মজাল সূত্র', ইহার শেষে আনন্দ বক্তা থাকাতে উহা আনন্দের পরবর্তী কাহারও দ্বারা রচিত বৃত্তিতে হইবে। বিশেষত বুদ্ধ যখন ঐ সূত্র বলেন তখন দশ হাজার লোকধাতু কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল ইত্যাদি অলীক কথা থাকাতে, যখন তাদৃশ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে তাদৃশ উত্তরকালে উহা (বা ঐ অংশ) রচিত বলা যাইতে পারে। সেইরূপ যে-সমস্ত সূত্রে বুদ্ধ, পূর্ববুদ্ধ বা স্বীয় পূর্ব জন্মের কাহিনী বলিয়াছেন সেই সব সূত্রও কাল্পনিক, বস্তুত তাহার উত্তরকালে বুদ্ধের মাহাত্ম্য ও সর্বশ্রেষ্ঠতা ও একটি একটি ধর্মনীতি ব্যাখ্যার জন্ত রচিত হয়।

একথা নিশ্চয় ছিল যে বুদ্ধ তাঁহার পূর্ব হইতে প্রচলিত যোগচর্যা অবলম্বন পূর্বক সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম মূলত পূর্বপ্রচলিত ধর্মের অধর্মণ *। কিন্তু পাছে তাঁহার মাহাত্ম্যের হানি হয়, পাছে প্রচলিত শাস্ত্র সকল হইতে তাঁহার পৃথক্কেুর ও সর্বশ্রেষ্ঠত্বেরহানি হয় ইত্যাদি কারণে তাঁহার অধর্মণতা বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণ স্বীকার করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বস্তুত পৃথিবীর সমস্ত ধর্মপ্রবর্তয়িতার ভক্তগণ নিজেদের আদর্শ পুরুষকে ঐরূপ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে অশেষ প্রকারে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার যেরূপ মুখ্য ও গৌণ স্ক্রকৌশল দেখা যায় তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, বৌদ্ধেরা উহাকে অতি উচ্চদেরের কলা কৌশলে (fine artএ) পরিণত করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এবিষয়ে কেহই তাঁহাদের পরাজয় করিতে পারেন নাই।

উক্ত কারণে বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণ প্রাচীন কোনও প্রকৃত ব্যক্তির নাম করেন নাই। কেবল স্ব স্ব ধারণার অনুরূপ কতগুলি প্রাচীন শাস্ত্রা কল্পনা করিয়া গিয়াছেন এবং স্বর্গ লোককেও গোড়া বৌদ্ধের দ্বারা

* R. Davids বলেন Buddha was a Hindu and the best of the Hindus.

অধিবাসিত করিয়া গিয়াছেন। (‘মোদন্তি বত ভো দেবা ভাবতিংসা
সইন্দকা । তথাংগতং নমস্সস্তা ধর্মস্ চ সুধম্মতন্তি’—মহাগোবিন্দ সূত্রং) ।
এ বিষয়ে দু একটি উদাহরণ দিলেই পাঠক বৃত্তিতে পারিবেন। দীর্ঘ
নিকায়ের মহাপদান সূত্রে বুদ্ধ কতকগুলি পূর্ব বুদ্ধের বিবরণ বলিয়াছেন
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধদের এই প্রচলিত ভদ্রকল্পের পূর্ব ৯১তম
কল্পে বিপস্‌সী (সংস্কৃত বিপশ্চিৎ), ৩১তম কল্পে সিথী, এই কল্পে
ককুসন্দো [ক্রকুসন্ধ], কোণগমনো [কনকমুনি] ও কাশ্যপ বুদ্ধ হইয়াছিলেন।
গৌতম বুদ্ধের মত ঠিক তাঁহাদের সমস্তই ছিল, মায় সিদ্ধ হইবার এক
একটি ‘বোধিদ্রুম’ পর্য্যন্ত। তাঁহারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতীয় [ব্রাহ্মণ ও
ক্ষত্রিয় ব্যতীত কেহ বুদ্ধ হয় না] এবং কাশ্যপাদি গোত্রীয় ছিলেন। তবে
কেহ রাজগৃহে, কেহ বারাণসীতে, কেহ পাঞ্চালদেশে জন্মগ্রহণ করেন।
আর তাঁহাদের আয়ু ৮০,০০০ বৎসর হইতে ২০,০০০ বৎসর পর্য্যন্ত !
এমন কি গৌতমের জায় তাঁহাদের শরীরের ভঙ্গাবশেষ রাখিবার জন্য
এক বা অধিক চৈতোরও উল্লেখ আছে (ইহা ‘আর্য্যভদ্রকল্পিক’ নামক
মহাযান সূত্রে আছে, ঐ সূত্রে আরও ১০০৩ ভবিষ্যবুদ্ধের উল্লেখ আছে) ।

আর এক উদাহরণ মহাসুদর্শন সূত্র। তাহাতে বুদ্ধদেব পূর্বজন্মে
কুশীনারায় ঐ নামীয় চক্রবর্তী রাজা ছিলেন একরূপ বিবরণ আছে।
কুশীনারায় নাম কুশাবতী ছিল। তাঁহা অতি সমৃদ্ধ নগর ছিল। তাহাতে
স্বর্ণ, রৌপ্য, স্ফটিক, বৈদূর্য্য লোহিতাঙ্ক (Blood Stone ?) ও সর্ব-
রত্নময় সাত প্রাকার ছিল। প্রাকারে চারি চারি ঐ ঐ রত্নময় দ্বার
ও দ্বারে ঐ ঐ রত্নময় সাত সাত, দশ মানুষ উচ্চ স্তম্ভ ছিল। আর
কুশাবতীতে সপ্ততাল-পংক্তি ছিল, ঐ সকল তাল ঐ ঐ রত্নময়। কোনটার
সোণার স্কন্ধ, রূপার পাতা, মণির ফল ; কোনটার বা রূপার স্কন্ধ, সোণার
পাতা, মণির ফল ইত্যাদি। আর মহাসুদর্শন রাজার পক্ষীরাজ হাতী ও
ঘোড়া ছিল এবং তাঁহার ৮৪,০০০ করিয়া স্ত্রী, প্রাসাদ, পালংখাট, রথ.

১। ভূমিকা (বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি) (১৫)

পত্নী, আদি ছিল। তিনি ৮৪,০০০ বৎসর বাল্য, ৮৪,০০০ বৎসর যৌবন ইত্যাদি পরিমিত আয়ুষ্ক ছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই স্বর্ণরৌপ্য মণি আদি লইয়া বালোচিত কল্পনার পর এই সূত্রে যে সুন্দর ধর্মনীতি আছে তদ্বিষয়ে অবশ্য কোন কথা নাই। তাহা যথা, অনিচ্চা বত সংস্কারা উপ্পাদবয় ধম্মিনো। উপ্পজিহ্বানিরুজ্জ্বলন্তি তেসং বৃপগমো সুখোতি ॥ অর্থাৎ অনিত্যা-বত সংস্কারা উৎপাদব্যয় ধম্মিণঃ। উৎপত্ত চ নিরুদ্ধতি তেষাং ব্যুপশমঃ সুখঃ ॥

বুদ্ধদেব অবশ্য অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু যিনি সত্য এবং বাক্য, কার্য ও মনের ঋজুতার বিষয়ে এত উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে এরূপ বালোচিত কল্পনার দ্বারা স্ব-মাহাত্ম্য কীর্তন করিবেন তাহা কখনই বিশ্বাস্য নহে। ফলতঃ তাঁহার ভক্তগণ কয়েক শতাব্দী পরে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করার জন্তু ঐ সব গল্প রচনা করিয়াছেন এবং প্রাচীন কোনও প্রকৃত ব্যক্তির নিকট তাঁহার অধর্মতা স্বীকার করেন নাই, কতকগুলি কাল্পনিক উপাখ্যান সৃজন করিয়া গিয়াছেন মাত্র।

বৌদ্ধগণ আরও বলেন, ভগবান্ যদি তাঁহার শিক্ষকদের নিকট নির্বাণ ধর্ম সম্যক্ শিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বোধি মূলে ছয় বৎসর 'ছক্রিয়া' বা কঠোর আচরণ করিতে হইত না। বোধিমূলে গোতম যে সাধন করিয়াছিলেন তাহার যে বিবরণ অধুনা পাওয়া যায় তাহা বুদ্ধের অনেক পরে লিপিবদ্ধ হয় এবং তাহা বহু পরিমাণে অলীক কল্পনা-মিশ্রিত। সহস্র-বাহু মার, মারবধু, মারানুচর প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ, গোতম মনে কি কি চিন্তা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ, ব্রহ্মাদি দেবগণের আগমন ও অনুরোধ ইত্যাদি বিষয় যে অলীক কল্পনা তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই বুঝিবেন। তাদৃশ কাল্পনিক আখ্যায়িকার রচয়িতারা বুদ্ধের অধর্মতার অপলাপ করিয়া মৌলিকতা সম্যক্ প্রতিপাদিত করিবার জন্তু ঐরূপ কথা প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুত মোক্ষমার্গের জ্ঞান হইলেই নির্বাণ সিদ্ধ হয় না, কঠোর সাধনের দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয়। গৌতম ছয় বৎসর ব্যাপী প্রযত্নের দ্বারা সমাধিসিদ্ধ ও বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকে আছে ‘বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ। ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্ধাংসস্ত-পশ্বিনঃ ॥’ অতএব গৌতম যদি মোক্ষবিরোধী কোন কঠোর তপঃ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি পূর্ব-প্রচলিত মোক্ষবিদ্যায় কতক অনভিজ্ঞ ছিলেন ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। আর যদি তিনি পূর্ব-প্রচলিত উপনিষদ মোক্ষবিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন ইহা স্বীকার করা যায় (বৌদ্ধেরা বলেন তিনি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন) তাহা হইলে তিনি উপনিষদুক্ত প্রথায় ‘অকাম, নিকাম, আপ্তকাম’ হইয়া ‘পরম, অজর, অমৃত’ পদে সমাহিত হইতে পারিয়াছিলেন। ইহা পরে দেখান হইবে যে উপনিষদুক্ত পরম পদকে তিনি অতিক্রম করেন নাই এবং কেহ করিতেও পারে না। তবে তিনি যে প্রাকৃত ভাষায় মৌলিক ভাবে মোক্ষতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় ; এবং সেই সূত্রাবলম্বন করিয়া তদীয় ভক্তগণ পরে তাঁহাকে মোক্ষমার্গের অদ্বিতীয় আবিষ্কর্তা বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্যদের মধ্যেও কেহ কেহ সাংখ্য ও যোগকে অপ্রাচীন মনে করিয়া বৌদ্ধদের প্রাচীনতা স্বীকার করেন। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ দেখা যায় :—

(১) বৌদ্ধশাস্ত্রে ৬২ প্রকার মত নিরসিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সাংখ্যমতের উল্লেখ বা নিরসন নাই *। (২) সাংখ্যীয় শাস্ত্র গ্রন্থ সকল অপ্রাচীন ও তাহা বৌদ্ধমত হইতে গৃহীত।

* তবে ব্রহ্মজাল সূত্রে এরূপ এক মতের উল্লেখ আছে যে—‘যাঁহারা “বীমংসা বা যুক্তির দ্বারায় আত্মা সিদ্ধ করেন।” তাহা আর্ষমতের

১। ভূমিকা (বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি) (১৭)

অন্ধদের হস্তি-দর্শন-শ্রায়ে মত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নির্বাণ ধর্মের আলোচনা করা। তাঁহাদের ভাষায় নির্বাণধর্মশাস্ত্রের কোন শব্দ নাই বলিলেই হয় এবং তাঁহারা উহার বহিস্তর ব্যতীত অন্তরের কিছুই বুঝেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের পক্ষে মোক্ষসম্বন্ধীয় দার্শনিক মত বিচার-পূর্বক কোনও তত্ত্ব স্থির করা যে সর্বতোভাবে ভ্রমপূর্ণ হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বাহা হউক তাঁহাদের যুক্তি কতদূর সঙ্গত তাহা দেখা যাউক।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যে ৬২ প্রকার মত নিরসিত হইয়াছে তাহা সমস্তই মোক্ষ-ধর্মের প্রতিপক্ষ। তাহারা যেমন বৌদ্ধদের হেয় সেইরূপ আষমোক্ষ-শাস্ত্রেরও হেয়। সুতরাং এরূপ হইতে পারে যে যোগমত বুদ্ধদেবের নিকট অনবদ্য ছিল বলিয়া তাহাই তাঁহার অবলম্বিত ছিল সেজন্য তিনি উহার নাম করিয়া উহার বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই, এবং তজ্জন্য পরবর্তী বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণও সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন নাই। ব্রহ্মজাল-স্ত্রে আছে যে ‘পূর্ব প্রচলিত কোন কোন অবৌদ্ধেরা আতপ্প, পধান, অনুবোগ, অপ্রমাদ, ও সম্যক্ মনসিকারের দ্বারা সমাধিসিদ্ধ হন, তাহাতে তাঁহাদের চিত্ত পরিশুদ্ধ, পর্যাবদাত, অনঙ্গন ও উপক্লেশশূন্য হয়’। এই পূর্ব প্রচলিত সাধন বৌদ্ধেরাও অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বাহারা উহার দ্বারা ক্ষুদ্র সিদ্ধিলাভ করিয়াই কৃতার্থম্ভ হন তাঁহাদেরই নিন্দা বৌদ্ধেরা করেন। অতএব পূর্ব-প্রচলিত যোগ-সাধন যে বৌদ্ধেরা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়। *

আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইতে পারে। কিন্তু সাংখ্যেরা আত্মাকে যে জন্ত শাস্ত বলেন, বৌদ্ধেরা তাহার উল্লেখ না করিয়া অন্তরূপ বলাতে উহা কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা সংশয়স্থল। বৌদ্ধেরা সাংখ্যবিদ্যায় ~~কোন~~ অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাও নিশ্চয়।

* গৌতম স্বকালে অপর সব শাস্ত্রা অপেক্ষা সম্যক্ শীলসম্পন্ন হইতে

ফলতঃ যে ব্রহ্মজালসূত্রে ঐ ৬২ মত হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহাতে পুনঃ ‘ন ইতো বহিষ্কা’—এই বাক্যের দ্বারা আর তাহা ছাড়া অণু কুমত নাই এরূপ বলা হইয়াছে । যেমন, শাশ্বতবাদী যাহারা আছে তাহারা সেই গ্রন্থোক্ত চারিপ্রকারের, তদ্ব্যতীত আর কোনরূপ শাশ্বতবাদী নাই, ইত্যাদি ।

কিন্তু আবার পাশ্চাত্যগণের মতে যাহা বুদ্ধাপেক্ষা বহু প্রাচীন উপনিষৎ সেই বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপদেশ আছে বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহার মোটেই উল্লেখ নাই । ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মশব্দ, তত্ত্বমসি, ওঙ্কারমূলক সাধন, আত্মা (বৌদ্ধদের মতেও ওল্‌থারিক বা স্থূল, মনোগয় এবং সংজ্ঞাময়—এই ত্রিবিধ আত্মা আছে, কিন্তু উহার অতিরিক্ত উপনিষদ আত্মার উল্লেখ নাই), দহর-পুণ্ডরীক বিদ্যা (বৌদ্ধেরা ইহারও কিছু গ্রহণ করিয়াছেন) প্রভৃতির নাম গন্ধও ব্রহ্মজালাদি বৌদ্ধসূত্রে পাওয়া যায় না । অতএব বৌদ্ধসূত্রে সাংখ্যমতের উল্লেখ না থাকাতে উহার

পারিতেন, কিন্তু ঐ ‘সীলপারিসীপুরিয়ার’ তিনি আবিষ্কর্তা নন । অনেকে মনে করেন অহিংসা ধর্ম্য বৌদ্ধদেরই আবিষ্কার, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি । বহুত বৌদ্ধশাস্ত্রে অহিংসা শব্দের ব্যবহার প্রায়ই নাই, ‘পানাতিপাত পটিবিরত’ এবং পরম ‘অব্যাপাদ’ এই শব্দদ্বয় অহিংসাস্থলে বহুশ ব্যবহৃত দেখা যায় ।

হিংসাভয়ে গলিত পত্র-কল ভক্ষণ প্রভৃতি কঠোর নিয়ম গৌতমের বহু পূর্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল । কি পূর্বে কি পরে বৌদ্ধাপেক্ষা আর্ষমতাবলম্বিগণ অধিকতর অহিংসাপরায়ণ ছিলেন । আর্ষমোক্ষমার্গীদের নিকটও পশুবলি আদি ‘নিয়মাবচ্ছিন্ন’ অহিংসা সম্যক পরিহার্য ছিল । যোগসূত্রে যে অহিংসার সার্বভৌম মহাব্রতের নির্দেশ করা আছে তাহা অপেক্ষা বিশুদ্ধতর অহিংসাব্রতের উল্লেখ জগতে কোথাও নাই ।

১। ভূমিকা (বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি) (১৯)

অপ্রাচীনতা প্রমাণ হয় হয় না ; কিন্তু উহা বুদ্ধ যে হেয় পক্ষে নিষ্ক্ষেপ করেন নাই ইহাই অনুমিত হয় ।

প্রত্যুত দশোপনিষদ্ অপেক্ষা অপ্রাচীন বলিয়া খ্যাত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদও যে বুদ্ধের পূর্ববর্তী ইহা পাশ্চাত্যগণের যুক্তিপ্রণালী (বঙ্গা বাহুল্য প্রভুব্যবসায়ীদের এরূপ যুক্তিপ্রণালী সর্বথা অপ্রতিষ্ঠ) অবলম্বন করিয়া প্রমাণিত হইতে পারে । শ্বেতাশ্বতরে 'কালঃ স্বভাবো নিয়তির্ষদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ কবয়ো বদন্তি', ইত্যাদি যে পৃকবর্তী প্রধান প্রধান মত উক্ত হইয়াছে তাহার কোনওটি বৌদ্ধমত নহে । বৌদ্ধেরাও ঐ সব মত স্বগুন করিয়াছেন । বুদ্ধের সমসাময়িক আজীবকাদি সম্প্রদায়ের সহিত ইহার কোন কোন মতের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তাহা যে সেই সময়ে উদ্ভাবিত তাহার কোন প্রমাণ নাই, তাহা তৎপূর্বের সহস্র বৎসর হইতেও প্রচলিত থাকা সম্ভব । আর শ্রুতির মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই প্রাণায়ামের বিশেষ উপদেশ আছে । বুদ্ধও প্রথমে প্রাণায়াম করিয়াছিলেন । মানবাদি ধর্মশাস্ত্রেও প্রাণায়াম গৃহীত দেখা যায় । মনুর দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থ (যাহাতে বৌদ্ধ মতের বিন্দুমাত্রও আভাস নাই), শ্রুতিই যাহার একমাত্র প্রমাণ, তাহা যে বেদবিহিত না হইলে প্রাণায়াম গ্রহণ করিয়াছে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে । সুতরাং উহা শ্বেতাশ্বতর হইতেই গৃহীত হইয়াছে বলিতে হইবে । বুদ্ধ ও তৎসময়ের আর্ষমতাবলম্বী প্রাণায়ামিগণের অর্থাৎ ঐ শ্রুতিই প্রমাণ ছিল ।

মনুর প্রাচীনতার দুই একটি যুক্তি এস্থলে নিবন্ধ হইতেছে । মনুতে সহমরণ প্রথার কিছুমাত্রও প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু মহাভারতের মূল ঘটনা অনুসারে মাদ্রী পাণ্ডুর সহিত সহমৃত্য হন । গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে মগধে ঐ প্রথা সম্পূর্ণ প্রচলিত দেখিয়া বান । চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকায়ুক যে মূল মহাভারত বেদব্যাস রচনা করেন তাহা অতি প্রাচীন । আশ্বলায়ন, পাণিনি প্রভৃতির পূর্বে যে মহাভারতের

মূল আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল তাহা তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে জানা যায় । যখন সহস্রাব্দে গ্রন্থ এক প্রাচীন বিষয় মনুতে নিবদ্ধ নাই, কিন্তু মহা-ভারতের মূল ঘটনার নিবদ্ধ রহিয়াছে তখন মনু যে তদপেক্ষা (ও পাণিনি মেগাস্থানীস্ অপেক্ষা) বহু প্রাচীন তৎপক্ষে সংশয় নাই । মনুতে ত্রিগুণ, পুরুষ, প্রকৃতি আদি সাংখ্যীয় পদার্থের প্রসঙ্গ আছে । আর মনুতে যে সন্ন্যাসচর্যা আছে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শীল তাহাকে কোন অংশেই অতিক্রম করেনা ।

পাশ্চাত্য মতানুযায়ী উপনিষদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন বৃহদারণ্যকে যে মোক্ষ ও তদাচরণ উক্ত হইয়াছে, বৌদ্ধেরা তাহার অধিক কিছুই বলেন নাই । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে সমাধি ও সম্যক্ বিরাগ মুক্তির কেবল মাত্র উপায় । বৌদ্ধেরাও তাহাই করেন ঋষিরাও তাহাই করেন । মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকে এইরূপ আছে যথাঃ—‘শান্ত, দান্ত, উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া—আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করিবে,’ ‘বদা সবে’ প্রমুচ্যন্তে কামা যেষশ্চ হৃদিশ্রিতাঃ’, ‘অকামঃ, নিষ্কামঃ, আশু-কামঃ,’ ‘পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা’ ইত্যাদি ত্যাগ । ফলতঃ যিনি শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষু হইয়া কেবল অভ্যন্তরে সমাহিত হন আর বাহ্যিক হৃদয় সম্যক্ কামনাশূন্য তাদৃশ পুরুষাপেক্ষা বৌদ্ধেরা কিছুই উত্তম আচরণ করেন না । হৃদয়ের সমস্ত কামনা ত্যাগ অপেক্ষা আর উচ্চ আচরণ কি হইতে পারে ? (বৌদ্ধদেরও নির্বাণ অর্থে বান বা ভৃগুর ত্যাগ) । বৌদ্ধশাস্ত্রে যে ৬২ প্রকার কুমত আছে ইহা তাহার অন্তর্গত নহে । সেই ৬২ প্রকার কুমত কেন হয় তাহার কারণ বৌদ্ধেরা এইরূপ বলেন—‘সৰ্ব্বে তে ছহি ফস্‌সায়তনেহি কুস্‌স ফুস্‌স পাটঘং বেদন্তি । তেসং বেদনা পচ্চয়া তহ্মা । তহ্মা পচ্চয়া জাতি । জাতিপচ্চয়া জরামরণং সোক পরিদেব ছুঃখং দোমনস্‌সুপায়াসা সন্তবন্তি’ (ব্রহ্মজালসূত্র) । অর্থাৎ সেই ৬২ প্রকার কুমতাবলম্বীদের সকলেরই ছয় স্পর্শায়তনের (রূপাদি

আয়তনের) সংস্পর্শে পটিষ বা ইন্দ্রিয়জবোধ উৎপন্ন হয় । তাহা হইতে সুখদুঃখ বেদনামূলক তৃষ্ণা হয় । তৃষ্ণা হইতে উপাদান বা গ্রাহ্যভাব হয় । উপাদান হইতে ভব বা জন্মের বীজ হয় । ভব হইতে জন্ম হয় । জন্ম হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন, দুঃখ, দৌর্ম্মনশ্চ, উপায়াসা বা নৈরাশ্য হয় ।

কিন্তু উপনিষদুক্ত প্রথার সর্বকামনাশূন্য হইয়া বাক্য ও মনের অগোচর পরম পদার্থে সমাহিত হইলে বাহ্যসংস্পর্শও হয় না, এবং তৃষ্ণাও হইতে পারে না, আর অত্ৰ কোন দোষও হয় না । তবে ঋষিগণ বলেন যে তখন ব্রহ্মে বা আত্মায় স্থিতি হয় আর বৌদ্ধগণ বলেন নির্বাণে বা অসঙ্খত ধাতুতে বা শূন্যে স্থিতি হয় । ঐ দুই পদেও ভেদাভেদ 'বৌদ্ধদর্শন ও আত্মা' প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে ।

বৃহদারণ্যকে অচ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মালোকে গমন পূর্বক একপ্রকার সংসারমোক্ষ বা অ-পুনরাবৃত্তি স্বীকৃত আছে । আর—'ন তশ্চ প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'—এই প্রকার বিদেহ-কৈবল্যরূপ সর্বোচ্চ পদও স্বীকৃত আছে । বৌদ্ধদের অনাগামিষ এবং (অর্হতের) পরিনির্বাণ উহারই অনুবর্তন ।

পাশ্চাত্যদের দ্বিতীয় যুক্তিতে বক্তব্য এই যে প্রচলিত সাংখ্য গ্রন্থের মধ্যে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা, সাংখ্যসূত্র ও মভাষ্য যোগসূত্র এই তিন গ্রন্থ প্রধান । খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (এবং পূর্বেও) চীন ভাষায় সাংখ্যকারিকার (হিরণ্যসপ্ততি বা সুবর্ণসপ্ততি বা কনকসপ্ততি) অনুবাদ হয়, অতএব ঐ গ্রন্থ তাহার পূর্বে কোনও সময়ে রচিত । কেহ কেহ বলেন খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে উহা রচিত । উহাতে উক্ত আছে যে কপিল হইতে আশুরি আদি শিষ্যপরম্পরাক্রমে ঈশ্বরকৃষ্ণ উহা শিক্ষা করিয়া গ্রথিত করিয়াছেন, আর উহা আখ্যায়িকা ও পরবাদ বর্জিত । ইহাতে বোধ হয় বর্তমান সাংখ্যসূত্রের ন্যায় সাংখ্য গ্রন্থসকল ঈশ্বরকৃষ্ণের পূর্বে বিদ্যমান ছিল ।

শঙ্করাচার্য্য উহা হইতে কোনও সূত্র উদ্ধৃত করেন নাই বলিয়া যে উহাঃ শঙ্করাপেক্ষা অপ্রাচীন তাহা যথার্থ নহে। বস্তুত শঙ্কর দুই একস্থলে মাত্র সাংখ্য বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, বহু বহু উদ্ধৃত করিলে বরং ঐ মত সম্ভবপর হইত। তবে ঐ সূত্রগ্রন্থে পরবর্তী অনেক আচার্য্য যে স্বকালে প্রচলিত পরবাদের খণ্ডনার্থ স্বরচিত সূত্রসকল প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়। কিন্তু উহাতে প্রাচীন সাংখ্যমতের বে অধিকাংশ রক্ষিত ভইয়াছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক সূত্র কারিকার সহিত অবিকল মিলে

প্রচলিত সাংখ্যগ্রন্থের মধ্যে যোগভাষ্যই প্রধান। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন ‘সাংখ্যাদি দর্শনাণ্যেব অশ্বেবাংশেষু কুৎস্নশঃ’ অর্থাৎ সাংখ্যাদি সমস্ত দর্শন এই ব্যাস ভাষ্যেরই অংশে সংস্থিত। বেদব্যাস-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন, এমন কি প্রচলিত বহু বৌদ্ধশাস্ত্রাপেক্ষাও প্রাচীন, ইহার প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দপূর্ণ সরল ভাষা, প্রাচীন ও অধুনালুপ্ত গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধার প্রভৃতি ইহার প্রাচীনতার সম্যক্ প্রমাণ। ‘শ্রামণ্যফল সূত্র’ একখানি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ, তাহাতে এই যোগভাষ্যের বচন প্রায় অবিকল উদ্ধৃত দেখা যায়, যথা প্রাকাম্য ও প্রাপ্তিসিদ্ধি সম্বন্ধে যোগভাষ্য—‘ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে অঙ্গুল্যাগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্র-নদম্,’ ৩১৫। শ্রামণ্যফল সূত্র যথা,—‘পথবিয়াপি উন্মজ্জ নিমুজ্জং কয়োতি সেব্যথাপি উদকে। ইমেপি চন্দিম সুরিরে এবং...পাণিনা পরামসতি পরিমজ্জতি’।

বলিতে পার শ্রামণ্যফলসূত্র হইতে ঐ বাক্য যোগভাষ্যে উদ্ধৃত হইতে পারে। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে আর্ষশাস্ত্রকারগণ বে বেদবাহু বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন একথা সর্বথা অসম্ভব। কিঞ্চিৎ যোগভাষ্যে উহা উদ্ধৃত বচন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে উহাঃ যে অবৌদ্ধদের পূর্বপ্রচলিত শ্রামণ্যফল তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে।

১। ভূমিকা (বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি) (২৩)

বৌদ্ধেরা অনেক প্রাচীন ও পূজ্য শব্দ সকলকে নিজেদের অভিমত অর্থ দিয়া নিজেদের শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন এরূপও দেখা যায়, যথা—‘যো সীলব্রত সম্পন্নো পহিতত্তো সমাহিতো । চিত্তং যশ্চ বসীভূতং একগ্গং সুসমাহিতং ॥ পূর্বে নিবাসং যো বেদী সগ্গাপয়ঞ্চ পস্‌সতি । অথ জাতিকুখয়ং পত্তো অভিঞঞা বোসিতে’ য়ুনি ॥ এতাহি তিহি বিজ্জাহি তেবিজ্জো হোতি ব্রাহ্মণঃ ॥’ (অঙ্গুত্তর নিকায় । তিক নিপাতে ব্রাহ্মণ বগ্গো) । অর্থাৎ তিন বেদের বিচার ত্রয়ীবিৎ হইয়া হয় না, কিন্তু যিনি শীলব্রত সমাপন্ন প্রহিতাত্মা (বীর্যাবান্) ও যিনি প্রজ্ঞাভাবিত তিনি ঐ তিন প্রকার বিদ্যার দ্বারা ত্রয়ীবিৎ ব্রাহ্মণ হন । তাহাকেই আমি (বুদ্ধদেব) ত্রয়ীবিৎ বলি । অত্বেরা কেবল লপিতলাপক ।

শ্রামণ্যের সর্বোচ্চ লোকুত্তর মার্গফল তাহাকেই বৌদ্ধেরা কেবল নিজেদের আবিষ্কার মনে করেন ।

চতুর্দশ ভুবন ও সেই সেই ভুবনের বাহারা অধিবাসী তাহাদের বিবরণ যোগভাষ্যে যেরূপ আছে বৌদ্ধশাস্ত্রেও তদনুরূপ দেখা যায় । ঐরূপ ভুবনের বিবরণ কেবলমাত্র যোগভাষ্যেই দেখা যায় । উহা যোগসম্প্রদায়ে প্রচলিত বিদ্যা । বুদ্ধবচন হইতেও দেখা যায় যে বুদ্ধের সময়ে ও পূর্বে অনেকে সমাধিসিদ্ধ হইয়া ঐ সব লোকে যান বা তদ্বিবরণ অবগত হন । আর ত্রয়স্বিংশদেব, ইন্দ্র, ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্মলোক প্রভৃতিও বৌদ্ধদের আবিষ্কৃত নহে । সুধম্মা, দেবসভা, যম, বৈশ্রবণ প্রভৃতিও পূর্বে প্রচলিত ছিল ।

অতএব যেহেতু আর্ষশাস্ত্রের মধ্যে যোগভাষ্যেই ঐরূপ চতুর্দশভুবনের প্রাচীনতম বিবরণ আছে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রেও যখন উহা গৃহীত দেখা যায় আর যখন উহা বৌদ্ধের নিজস্ব নহে, তখন উহা যোগভাষ্য হইতেই গৃহীত বলিয়া অনুমান করাই সম্ভব । অবশ্য বৌদ্ধেরা উহার কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন এবং উহার কতকগুলিকে রূপাবচর, কতকগুলিকে অরূপাবচর ইত্যাদি নিজেদের উদ্ভাবিত সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন ।

যাম্য বৌদ্ধেরা ব্রহ্মলোককেই সর্বোচ্চ লোক রাখিয়াছেন, আর উদীচ্য বৌদ্ধেরা ব্রহ্মলোক হইতে ব্রহ্মাকে নীচে নামাইয়া, বোধিসত্ত্বলোক ও আদি বুদ্ধলোককে সর্বোচ্চে বসাইয়াছেন, কিন্তু পরিনির্বৃত্ত কোনও বুদ্ধকে বা অর্হৎকে লোক মধ্যে রাখা যাম্য বৌদ্ধশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, যতদিন তাঁহার শরীর আছে ততদিনই সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। পরিনির্বাণের পর আর দেবমন্ডব্য কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। এইমত যোগদর্শনের অন্তরূপ।

পাশ্চাত্যগণ যে বলেন ‘Buddhism’ was a protest against the prevailing animism—ইহাও অসার কথা। চন্দ্রদেব, সূর্যদেব, দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে বুদ্ধের পূর্বে যেরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল তাহা ‘animism’ হইক আর যাহাই হউক, বুদ্ধও সেইরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। বায়ুদেবতা ইন্দ্র, দেবরাজরূপে বহুপূর্ব হইতেই প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐতরের ব্রাহ্মণে (প্রথম পঞ্চিকা । ১১) ইন্দ্রের বাবতা প্রভৃতি মহিমার উল্লেখ তাহার প্রমাণ। বৌদ্ধগণও ঐরূপ ইন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত ‘animism’ পদার্থের দ্বারা পাশ্চাত্যগণ যে ভারতীয় ধর্মের ব্যাখ্যান করেন তাহা ভ্রান্ত ধারণার উপর স্থাপিত।

যোগভাষ্যকার স্থানে স্থানে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন (যদিও সূত্রের মধ্যে ঐ বাদের কুত্রাপি প্রসঙ্গ নাই) করিয়াছেন, ইহাতে অনেকে বলিবেন তবে তিনি ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী নাগর্জ্জুনের (খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী অথবা তৎপরে) পরের লোক। একথাও সর্বথা অসার। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ বহুপূর্বের। বিজ্ঞান পদার্থ বৌদ্ধেরা উপনিষৎ হইতে লইয়াছেন। বিজ্ঞান পরিণামী পদার্থ, প্রতিক্ষণে তাহার ভিন্ন ভিন্ন বা (একাগ্রতায়) একজাতীয় পরিণাম হয়। অতএব বিজ্ঞান সেই পরিণামের প্রবাহস্বরূপ। আর্যেরা বলেন বিজ্ঞানের মূলে এক অম্বিত সংপদার্থ আছে—বিজ্ঞানবৃত্তি সকল যাহার পরিণাম বা যাহার উপর বিজ্ঞান-প্রবাহ

১। ভূমিকা (বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি) (২৫)

বিবর্তিত। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে সেই মৌলিক সংপদার্থ বা substance স্বীকৃত
নাই। তাঁহাদের মতে পূর্বাধিক বিজ্ঞানের কোনও বাস্তব সম্বন্ধ নাই।

প্রাচীনতম বৌদ্ধ পিট শাস্ত্রে এইরূপ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের ('ক্ষণ
ভঙ্গনবাদ' নামটি বোধ হয় পরে প্রদত্ত হইয়াছে। যোগভাষ্যে উহাকে
'বৈনাশিক' বলা হইয়াছে) ভূয়োভূয়ঃ প্রসঙ্গ আছে। দীর্ঘনিকায়ের
'পোর্টপাদ সূত্র' দ্রষ্টব্য। বুদ্ধ এই মতের আবিষ্কর্তা অথবা ইহা পূর্ব
হইতে ছিল কিনা (বৌদ্ধেরা বলেন যে বৌদ্ধশাস্ত্র পূর্ব হইতে ছিল)
তাহার স্থিরতা নাই। ফলতঃ পিটক রচনার পূর্বে এবং বুদ্ধের পরে যে
সময়ে ভারতে বৌদ্ধমতের খুব চর্চা হইতেছিল সেই সময়ে যে যোগভাষ্য
রচিত হইয়াছে (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দে) তাহা উক্ত
যুক্তি হইতে অনুমিত হইতে পারে।

যোগসূত্রের প্রথম পাদের ৩২, ১৩ এবং চতুর্থ পাদের ২০, ২১ প্রভৃতি
সূত্রের ভাষ্যস্থলে ভাষ্যকার ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু
সর্বস্থানেই প্রসঙ্গক্রমে উহার উত্থাপন করিয়াছেন, কোনও সূত্রেই ঐ
বিষয়ে স্বার্থ নাই। তবে সেই সেই সূত্রে সূচিত তত্ত্বানুসারে ক্ষণিক
বিজ্ঞানবাদ যে অগ্ৰাঘা তাহা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন মাত্র।

যোগসূত্রে বৌদ্ধনত বা অগ্ৰাঘা কোনও দর্শনের মতের প্রসঙ্গ না
থাকাতে, উহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিঞ্চিৎ
সাংখ্যযোগ যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, ইহা ভারতের চিরন্তন ধারণা।
বৃহদারণ্যক উপনিষদে আশুরি পতঞ্জলি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কতকগুলি
নাম পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন কোনও পতঞ্জলি যোগসূত্রের প্রণেতা।
এইরূপ প্রবাদ আছে যে ভগবান্ অনন্ত পুনঃপুনঃ অবতীর্ণ হইয়া যোগসূত্র,
চরক ও মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন। অতএব যোগসূত্রকার ও মহাভাষ্যকার
এক ব্যক্তি না হওয়াই সম্ভব। বিশেষতঃ যোগসূত্রের ও মহাভাষ্যের মতের
ভিন্নতা দেখা যায়। যিনি যোগসূত্রে জগতে অতুলনীয় চিন্তার গাভীর্ষ্য

দেখাইয়াছেন, যিনি পরমার্থ তত্ত্বকে বিশুদ্ধ জ্ঞায়ালঙ্কৃত নির্মূল যুক্তির দ্বারা স্বচ্ছ ও প্রোক্ষল করিয়াছেন, তিনি যে ব্যাকরণ মহাভাষ্যে আবার অনর্থক অন্তরূপ মত প্রচার করিবেন তাহা মোটেই সম্ভবপর নহে। অতএব যোগসূত্রকার, চরক-রচয়িতা ও মহাভাষ্যকার যে পৃথক পৃথক ব্যক্তি তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পঞ্চশিখাচার্য্যাকৃত সাংখ্যের যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ছিল তাহা হইতে উদ্ধৃতবচন এই যোগভাষ্যে পাওয়া যায়। তদ্যতীত বার্ষগণ্য আচার্য্যের বচন ও কোন কোন লুপ্তশ্রুতি হইতে উদ্ধৃত বচনও পাওয়া যায়। সেই এক পঞ্চশিখা বচন হইতে জানা যায় যে আদিবিদ্বান্ কপিল নির্মাণ। চিত্তাধিষ্ঠান পূর্বক আসুরি ঋষিকে সাংখ্যাতন্ত্র উপদেশ করেন। আসুরি উহা ঋষিসমাজে প্রচার করেন। বুদ্ধের পরে যেমন ভারতে ধর্ম্মচর্চার অভ্যুদয় হয় সেই সময়েও কপিলের মাহাত্ম্যে ঋষিসমাজে জ্ঞানযোগের চর্চার অভ্যুদয় হয়, (‘কাপিলং মণ্ডলং মহং’ হয়) ইহা মহাভারতের প্রাচীন সংবাদ হইতে জানা যায়। ইহা ঋষিযুগের কথা, মহাভারতে ইহাকে ধর্ম্মযুগ বলা হইয়াছে। বুদ্ধের সময়ে কেহ ঋষি ছিলেন না তাহা সন্দেহ্য। অতি পুরাকালে যে ঋষিযুগ ছিল—তখনও লোকের এইরূপ ধারণা ছিল, তাহা বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে জানা যায়। বুদ্ধের ভক্তেরা তাহাকে সম্মানসূচক ‘মহেসি’ না মহর্ষি নাম দিয়াছেন।

আসুরির প্রপান শিষ্য পরিব্রাজক পঞ্চশিখা মিথিলাদি দেশে পরিভ্রমণ করেন, তিনিই প্রথম সাংখ্যশাস্ত্র প্রণয়ন ও সম্যক প্রচার করেন। তাহাতেই কোন কোনও উপনিষৎ, মনু ও মহাভারতাদি যাবতীর আর্ষ-গ্রন্থ সাংখ্যমতে অনুপ্রাণিত দেখা যায়। “সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র”, মহাভারত।

মহাভারত অতি প্রাচীন সংবাদসমূহের পেটকস্বরূপ। যদিও উহাতে অনেক অপ্রাচীন ইতিহাস আছে, কিন্তু আবার যে সময়ে আর্ষ্যসমাজে

১। ভূমিকা (বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি) (২৭)

বিবাহ প্রথা ছিল না, স্ত্রীগণ 'অনারতা' ছিল তাহারও স্মৃতি আছে (আদিপর্ব । ১২২ অঃ) । সেই মহাভারতের এক প্রাচীন সংবাদ হইতে জানা যায় যে পঞ্চশিখ বিদেহপতিজনদেবের ও ধর্মধ্বজ জনক নরপতির শাস্তা ছিলেন :

কোশলের পূর্ববর্তী রাজ্যের নাম বিদেহ । বেদের 'বিদেঘ' নাম হইতেই সম্ভবতঃ এই নামের উৎপত্তি; এই বিদেহ রাজ্য অতি প্রাচীন । মহাভারতের মূল ঘটনা, যাহা ঐ গ্রন্থের অতি প্রাচীন অংশ, তাহাতে জানা যায় যে যুধিষ্ঠিরাদির সময়ে ঐ রাজ্য লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল । বুদ্ধের সময়ে ঐ রাজ্য ছিল না । বৌদ্ধশাস্ত্রে কেবল 'বেদেহিপুত্র অজাতসত্বু' এই বাক্যে বৈদেহী নাম পাওয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধঘোষ বলেন তিনি ঐ নামের একজন কোশল রাজকুমারী ।

বুদ্ধের সময়ে এই কয়টি প্রধান জনপদ ছিল ; যথা—'কাসিকোসলেসু বজ্জিমল্লেশু চেতিবংসেশু কুরুপঞ্চালেসু মচ্ছসুরসেনেশু'—(দীর্ঘনিকায় ! জনবসভসুত্ত) । অর্থাৎ কাশী, কোশল, বজ্জি, মল্ল, চেদি, বংস, কুরু, পঞ্চাল, মৎশু ও সুরসেন । এই সকল দেশে এবং অঙ্গ মগধেই বুদ্ধের প্রসার ছিল । আর মহা সূদর্শনসূত্র হইতে জানা যায় সে সময়ে চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কোশাঘ্নী ও বারাণসী প্রধান নগর ছিল । উহার মধ্যে বজ্জি ও মল্লদেশেই প্রাচীন বিদেহ রাজ্যের স্থান । মহাভারতে মল্লদেশের নাম আছে বজ্জির নাম নাই ।

এদিকে শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও বিদেহপতি জনকের আখ্যান পাওয়া যায় । অতএব অন্ততম জনকরাজার শাস্তা পঞ্চশিখাচার্য্য যে বুদ্ধের বহু পূর্বের লোক তদ্বিষয়ে সংশয় নাই । কত পূর্বের তাহা স্থির করিবার উপায় নাই । তবে দেখা যায় ভারতবর্ষে নানাধিক প্রতি সহস্রবর্ষে এক একবার ধর্মচর্চার অভ্যুদয় হইয়াছে । বুদ্ধের প্রায় সহস্র বৎসর পরে বেদান্ত মায়াবাদ ও তাহার প্রায় সহস্রবর্ষ পরে বৈষ্ণব-ধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছে । অধুনা ভারতে বৈষ্ণব ধর্মেরই

প্রাবল্য । বুদ্ধও বলিয়াছেন তাঁহার ধর্ম সহস্রবর্ষ পরে হীনপ্রভ হইয়া যাইবে । কপিলর্ষিপ্রণোদিত হইয়া ঋষিসমাজে যে ধর্মচর্চা প্রাচুর্ভূত হয় তাহা গৌতমবুদ্ধের পূর্বে ঐ সহস্রবার্ষিক কালচক্রের একাধিক চক্র পূর্বে ঘটিয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে ।

ইহা আরও দ্রষ্টব্য যে সাংখ্যের প্রচলিত গ্রন্থ সকল অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন হইলেও প্রাচীন সাংখ্যমত তাহাতে বিপর্যস্ত হয় নাই । সৌভাগ্যের বিষয় সাংখ্যীয় তত্ত্বসকল যুক্তিমূলক । অনুলোম ও বিনোম যুক্তির দ্বারা উহা সাধিত হয়, তজ্জন্ম 'নিগুণ পুরুষ' ও 'ত্রিগুণ' উক্ত হইলেই সাংখ্যের সমস্তই সূচিত হয় । যেমন জ্যামিতির কোনও প্রতিজ্ঞা ও তাহার প্রমাণের একাংশ পাইলে, অবশিষ্টাংশ অসূচিত থাকে না, ইহাও সেইরূপ । বস্তুত পঞ্চশিখাচার্যের প্রবচনের নহা অবশিষ্ট আছে তাহা অধুনাও সমগ্র সাংখ্য যোগকে সম্যক সূচিত করিতেছে (কপিল-মঠের 'সভাঙ্গ্যং পাঞ্চশিখং সাংখ্যসূত্রম্' দ্রষ্টব্য) ।

অতএব প্রাচীন সাংখ্যযোগের উপর যে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি স্থাপিত তদ্বিষয়ে সংশয় নাই । তবে নির্বাণের সাধন সমূহ ও তল্লভ্য পরম পদ সমান হইলেও ঐ নির্বাণ-সাধন বৌদ্ধেরা ভিন্নদিক হইতে বুঝাইয়া গিয়াছেন । সেই বুঝাইবার প্রণালীর বা অভিধর্মের সহিত সাংখ্যপ্রণালীর মোটেই সাদৃশ্য নাই । সাংখ্যে অনুভূয়মান পদার্থের মৌলিক বিশ্লেষণ ও সমবায় আছে, আর অভিধর্মো কেবল অবিশ্লিষ্ট (complex) পদার্থের বিচার । বৌদ্ধশাস্ত্র সাধারণের মধ্যে প্রচারযোগ্য করার জন্ত প্রথমে মাগধী ভাষায় ও ভাদ্রা সংস্কৃত ভাষায় (গাথার ভাষায়) রচিত হয় এবং প্রধানত যোগাচরণের বিষয় (দার্শনিক বিচার বাদ দিয়া) তাহাতে প্রপঞ্চিত হয় । বলা বাহুল্য একই বিষয় ঐরূপে নূতন করিয়া প্রচার করিতে গেলে ক্রমশ ভিন্নাকার ধারণ করে । সেইরূপেই বৌদ্ধধর্মের সাংখ্যযোগ হইতে বাহ্য ভেদ হইয়াছে ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে মহর্ষি কপিল যে বুদ্ধের বহু পূর্বের লোক তাহা হিন্দু বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি সমস্ত ভারতীয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। বৌদ্ধেরা বলেন ইক্ষ্বাকু (পালি ওক্কাকু) রাজার সময় কপিলবাস্তুতে মহর্ষি কপিলের বাস ছিল। কপিলবাস্তুকে অশ্বঘোষ (খৃষ্টাব্দের প্রথমের লোক বলিয়াছেন “মহর্ষেঃ কপিলশ্চ বাস্তু” (বুদ্ধচরিত)। আধুনিক পাশ্চাত্যেরা কপিলকে বুদ্ধের পরবর্তী বলিতে সাহস করেন না বটে কিন্তু কেহ কেহ সংশয় মাত্র করেন। চিরন্তন ঐ ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ মত স্থাপন করিতে হইলে তাহার প্রমাণ অপরপক্ষকেই দিতে হবে, শুদ্ধ সংশয় করা প্রমাণ নহে। অতএব মহর্ষি কপিল ও সাংখ্যযোগবিদ্যা বুদ্ধের বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ সেই বিদ্যা অরাড় কালাম ও রুদ্রকের নিকট শিক্ষা করিয়া তাহাতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। অরাড় কালাম যে সাংখ্য ছিলেন জনক, জৈগীষব্য, বুদ্ধ পরাশর প্রভৃতি সাংখ্যযোগীরা যে বুদ্ধের বহু পূর্বের লোক তাহা অশ্বঘোষের সময় প্রসিদ্ধ কথা ছিল। অরাড়ের নিকট সাংখ্য শিক্ষা করিয়া “বিশেষ” শিক্ষার জন্য সিদ্ধার্থ রুদ্রকের নিকট বাইয়া বহুকাল শিক্ষা করেন। শিক্ষা শেষ করিয়া আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি সমাধিসাধন করেন। অতএব রুদ্রক যোগাচার্য্য ছিলেন। বুদ্ধ সিদ্ধ হইয়া কার্য্যকর সাংখ্যযোগের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাই সাংখ্যযোগের বিরুদ্ধে কথা বলেন নাই। অবশ্য সে সময়ে অরাড় ও রুদ্রকের সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু বুদ্ধ যে অজিতকেশকম্বলী, পুরাণকাশ্যপ, নিগ্রহ নাটপুত্র প্রভৃতি ছয় সমসাময়িক (আজীবক-জৈন-চার্বাক-আদি) সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে অরাড় ও রুদ্রকের সম্প্রদায় নাই। অতএব ঐ দুই সম্প্রদায় বুদ্ধের অবলম্ব্য ও অনুকূল ছিল তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। (প্রাচীন বৌদ্ধেরা দর্শন বিষয়ে উন্নত ছিলেন না। কিন্তু দর্শন ব্যতীত আত্মরক্ষা হয় না। তাই খৃষ্টাব্দের প্রথম সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বৌদ্ধেরা গ্ৰীষ্মাদি দর্শনের প্রভূত আলোচনা করিয়া যথাসাধ্য

আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হন । এ বিষয় দ্বিতীয় ভূমিকা বাহা সংস্কৃত বৌদ্ধ-শাস্ত্র হইতে সংকলিত—তাহাতে দেখান হইয়াছে । প্রকাশক) ।

২। ভূমিকা (নৈরাহ্যবাদ ও আত্মবাদ) :

বৌদ্ধদের ত্রিপেটক বাহা পালি ও সংস্কৃতে লিখিত, তাহা দর্শন হিসাবে বিশেষ উপাদেয় নহে ও অত্যন্ত পুনরুক্তিদোষে দূষিত । সংস্কৃত অভিধর্ম পালি অপেক্ষা কিছু ভাল হইলেও দার্শনিক বিশদতাহীন । উহা কতকটা আমাদের উপনিষদের ত্রায়, তবে অতিস্বীততা-দোষে দূষিত । কিন্তু অশ্বঘোষ, দিঙ্‌নাগ, নাগার্জুন, শান্তুরক্ষিত, বুদ্ধপালিত, কমলশাল, চন্দ্র-কীর্ত্তি, ধর্মকীর্ত্তি, শান্তিদেব, প্রজ্ঞাকরমতি প্রভৃতি সংস্কৃত বৌদ্ধলেখকগণ, বাহাদের পুস্তক সৌভাগ্যবশতঃ বিলোপ হইতে রক্ষিত হইয়াছে— তাঁহারা রীতিমত দার্শনিক প্রণালীতে স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করিয়াছেন । এতদিন বৌদ্ধমতের বিষয় তাঁহাদের খণ্ডনকারীদের গ্রন্থ হইতে জানা যাইত ; এখন বৌদ্ধদের নিজেদের লেখা হইতেই তাহা জানা যায় ।

বুদ্ধের পর সহস্র বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধদের প্রসিদ্ধ চারিটা সম্প্রদায় হইয়াছিল, যথা—সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক । উহাদের মধ্যে আবার অনেক উপসম্প্রদায় ঘটিয়াছিল । কনিষ্কের সময়ে প্রধান ১৮টার নাম পাওয়া যায় । যথা—(১) আর্যাসর্বান্তিবাদ (ইহার মধ্যে মূলসর্বান্তিবাদ প্রভৃতি ৭টা), (২) আর্যাসম্মতীয় (কুরুকুল্লক, আব-স্তিক প্রভৃতি তিন), (৩) আর্যমহাসাজ্জিক (পাঁচটা) ও (৪) আর্যাস্থবির (মহাবিহার আদি তিনটা) ।

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্র্যবাদ) (৩১)

যোগাচারদের মত অতি অল্পই জানা যায়। সর্বাপেক্ষা মাধ্যমিকদেরই প্রসার বেশী ছিল ও তাঁহাদের গ্রন্থই অধিক পাওয়া গিয়াছে। লঙ্কাবতার-সূত্র যোগাচারদের পক্ষীয় গ্রন্থ বলিয়া কথিত হয়। যোগাচারেরা বিজ্ঞান-শাস্ত্রবাদী। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকেরা সর্বাশ্রিতবাদী বা অন্তর্বাহ্য পদার্থের অশ্রিতবাদী।

বৌদ্ধদের মধ্যেও আশ্র্যবাদী ছিল। একজন বৌদ্ধ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে “কেচিচ্চ সৌগতশ্রুত্যা অপ্যাশ্র্যানং প্রচক্ষতে।” কিন্তু শূন্য বা নৈরাশ্র্যবাদই বৌদ্ধদের সাধারণ প্রবল মত এবং বোধ হয় বুদ্ধের পর হইতেই প্রচলিত। বুদ্ধ চরমতত্ত্বের বিষয়ে শূন্যশব্দ ব্যবহার করাতে বোধ হয় শূন্যবাদ প্রচলিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ শূন্য অর্থে কিছু না। নির্বাণ শূন্য বা কিছু না হইলে তজ্জগৎ চেষ্টা করা বিজ্ঞ অজ্ঞ কাহারও পক্ষে সম্ভববোধ হইবে না। আর্ষ দার্শনিকেরা এইরূপ শূন্যবাদকে বেশ সূক্ষ্মসহকারে নিরাকৃত করিয়াছেন। কিন্তু “আগ্রহী বত নিনীষতি যুক্তিং যত্র তত্র মতিরশ্রু নিবিষ্টা”। অতএব বৌদ্ধরাও সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া নানা ত্রায়ের ফাঁকি তুলিয়া শূন্যবাদ সমর্থন করার চেষ্টা করিয়াছেন। বুদ্ধের বচন বলিয়া উদ্ধৃত হয় যে “শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশোং পশোং শূন্যং বহির্গতং। ন বিত্ততে সোহপি কশ্চিৎ যো ভাবয়তি শূন্যতাং ॥” অতএব বৌদ্ধদের যে প্রকারেই হউক শূন্যবাদকে উপপন্ন করিতে হইয়াছে। শান্তি-দেব বলেন, “বিনা শূন্যতয়া চিত্তং বদ্ধমুৎপত্ততে পুনঃ। যথাঃসংজ্জিসমাপত্তৌ ভাবয়েত্তেন শূন্যতাং ॥” যেমন অসংজ্জিধ্যানের পরও (আশ্র্যবাদীদের চরম সমাধিকে বৌদ্ধেরা ন সংজ্জি নাসংজ্জিসমাপত্তি বলেন) চিত্ত উঠে সেইরূপ শূন্যতা বিনা চিত্ত বদ্ধ থাকে ও পুনঃ উঠে, অতএব শূন্যতা ভাবনা করিবে। “তস্মাৎ শূন্যতৈব বোধিমার্গ ইতি স্থিতঃ”। আশ্র্যগ্রাহ, সত্ত্বগ্রাহ, জীবগ্রাহ ও পুদ্গলগ্রাহ, ইহা বুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন। “অনিত্যং দুঃখং অনাশ্র্যং” বৌদ্ধদের এই প্রসিদ্ধ জপমন্ত্রের দ্বারা শূন্যতা ভাবনা করিতে হয়।

কিন্তু সদ্বস্তুর মূল যে একবারে অসং এরূপ অযুক্ত কথা উপপাদন করা (হাজার গায়ের ফাঁকি তুলিয়াও) সম্ভবপর নহে । তাই বুদ্ধের উক্তির দোহাই দিয়া নাগার্জুন বলিয়াছেন “শূন্যতা চ ন চোচ্ছেদো সংসারশ্চ ন শাস্বতঃ । কস্মিণোহবিপ্রণাশশ্চ ধর্ম্মো বুদ্ধেন দেশিতঃ ॥ (মধ্যমিকসূত্র ১৭।২০) “আত্মেত্যপি প্রজ্ঞপিতম্ অনাত্মেত্যপি দেশিতং । বুদ্ধেরাত্মা ন চানাত্মা কশ্চিদিত্যপি দেশিতং” । (১৮।৬) অর্থাৎ শূন্যতা অর্থে অত্যন্ত নাশ নহে । সংসৃতিও শাস্বত নহে । কর্ম্মের অপ্রণাশ বা স্বভাবে না থাকারূপ শূন্যতা হইতেই বিপাক হয়, এইরূপ ধর্ম্মই বুদ্ধের দ্বারা কথিত হইয়াছে । বুদ্ধেরা কোথাও আত্মা, কোথাও অনাত্মা এবং কোথাও বা আত্মা বা অনাত্মা ইহার কোনটাই নয়, এরূপ উপদেশ করিয়াছেন ; এই শেষেরটা মাধ্যমিক মত । মাধ্যমিকদের মতে কিছু আছেও বলিব না— নাইও বলিব না “অস্তি ও নাস্তি” এই দুই কোটা । আর অস্তি ও না নাস্তিও না’ ইহাই ঐ দুইয়ের মধ্যম মত । তাদৃশ মধ্যম মত বলাই মাধ্যমিকত্ব । কিন্তু ইহা ‘বলিব না’ মাত্র । ‘কি বলিব’ তাহা না থাকাতে উহা প্রকৃত গায়সঙ্গত দর্শন নহে । আছে কি নাই ইহার একটা না বলিলে দুই প্রকার ভাব বুঝায়, (১) সংশয় বা থাকিতেও পারে না থাকিতেও পারে ; (২) আছে কিনা জানি না । ইহা ছাড়া ঐরূপ বলিলে প্রলাপ বলা হয় । মাধ্যমিকেরা প্রথম দুই অর্থে বলেন না, সূত্রাং তাঁহাদের দৃষ্টি ভ্রমাত্মক । আর অনাত্মা আছে আত্মা নাই বলিলে ঘটাবাব আছে ঘট নাই বলা হয় ।

শূন্য যদি উচ্ছেদ না হয় তবে উহাকে সত্তা বলিতে হইবে । প্রজ্ঞাপারমিতাতেও আছে “শূন্যরূপেণ কৌশিক তিষ্ঠতা” । উহা যদি সত্তা হয় তবে দৃষ্টধর্ম্মশূন্য সত্তা হইবে । ইহাই সাংখ্যের অব্যক্ত । অতএব সাংখ্যের কথাই অন্যায্য ভাষায় বৌদ্ধ বলেন । যে বৌদ্ধদের মতে শূন্য অभावমাত্র, তাঁহাদের কথা নিতান্তই অদার্শনিক । চিত্তবৃত্তিনিরোধ সাংখ্য ও বৌদ্ধ উভয়েরই

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্র্যবাদ) (৩৩)

পরাগতি। তৎকালে চিত্তের উপাদান অব্যক্তভাবে বা ব্যক্তধর্মশূন্যভাবে থাকে, ইহা সাংখ্যমত। যে বৌদ্ধেরা বলেন,—তখন ‘শূন্য’রূপে থাকে, তাহাতে তাঁহাদের সাংখ্যের কথাই অস্পষ্টভাবে ঘুরাইয়া বলা হয়। আর যাহারা বলেন, তখন অভাব হইয়া যায়, তাঁহাদের অন্ত্য অদার্শনিক ও অবোধ্য কথা বলা হয়। বৌদ্ধদের যুক্তি (অবশ্য ইহা স্বাধীন যুক্তি নহে কিন্তু তথাকথিত বুদ্ধের উক্তিকে মূল করিয়া যুক্তি) এইরূপ—বুদ্ধ শাস্ত্রবাদ ও উচ্ছেদবাদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অতএব উহারা অগ্রাহ্য। যেমন কস্ম সঙ্কে নাগার্জুন বলেন, “তিষ্ঠেদাপাককালাচ্ছেৎ কস্ম তন্নিত্যতামিয়াৎ। নিরুদ্ধং চেন্নিরুদ্ধং তৎ কিং ফলং জনয়িষ্যতি ॥” (মাধ্য ১৭।৬) অর্থাৎ বিপাকের সময় পর্য্যন্ত যদি কস্ম থাকে বল, তবে কস্ম নিত্য বা শাস্ত্রত হয়। আর নিরুদ্ধ হইলে বা কস্মের পর যখন উহা দেখা না যায়, তখন উহার অত্যন্তনাশ হইয়া গিয়াছে বলিলে ভবিষ্যৎ কস্মফল কিরূপে হইবে? অতএব উহার কোনটাই বক্তব্য নহে। উদাহরণস্বরূপ বলেন যে বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষাদি ক্রমে ফল হয়। অতএব “বীজ হইতে যখন সন্তান (কার্যের ধারা) ও সন্তান হইতে ফলোদ্ভব দেখা যায়, তখন বলিতে হইবে ‘বীজপূর্বং ফলং’ অতএব কিছু উচ্ছিন্ন হইল না ও কিছু শাস্ত্রত হইল না” (মাধ্য ১৭।৮) ইহা কেবল কথার মারপেঁচ মাত্র। সাংখ্যদিগের সহজপ্রজ্ঞার দৃষ্টিতে (common sense view) অদৃশ্য কৃত কস্ম সংস্কাররূপে থাকে, পরে তাহা ব্যক্ত হইয়া ফলবৎ হয়। সাংখ্যেরাও ব্যক্ত দ্রব্যকে নিত্য বলেন না (“হেতুমদনিত্যমব্যাপি” ইত্যাদি সাংখ্যকারিকা দ্রষ্টব্য), কিন্তু তাহারা যাহা দ্বারা নিশ্চিত সেই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিভাব দ্রব্যকে পরিণামিনিত্য বলেন; কারণ উহা বরাবর আছে ও থাকিবে। নাশ অর্থে সাংখ্যমতে অত্যন্ত উচ্ছেদ নহে, কিন্তু কারণে লয় অর্থাৎ মূলকারণ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির যে সমতা (যাহাতে পরস্পরে অভিভূত হয়) তদ্বাবে থাকা। এইরূপেই অক্রোধরূপ কস্মের

দ্বারা ক্রোধরূপ কর্ম নাশ হয়। সূতরাং কর্ম বা অণু ব্যক্ত পদার্থ এক-
 স্বরূপে নিত্য নহে, কিন্তু সদাই পরিণামী। এইরূপে কেবল পারিভাষিক
 বাক্যভেদ করিয়া বৌদ্ধেরা (বুদ্ধ নহেন) সাংখ্যীয় সম্যগদর্শন হইতে
 নিজেদের ভিন্ন করিয়াছেন ও একই কথা ঘুরাইয়া অণুরূপে বলিয়াছেন।
 অতঃপর বিস্তৃতভাবে বৌদ্ধমত পরীক্ষিত হইতেছে। বৌদ্ধেরা নিগুণ
 আত্মবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেন তাহা অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে
 বেশ সংক্ষেপে ও সারভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই যুক্তিসকল ও
 তাহার উত্তর দেখান যাইতেছে। নাগার্জুনাতির কথাও পরে বলা হইবে।
 (১ম) “বিকার প্রকৃতিভ্যো হি ক্ষেত্রজ্ঞং মুক্তমপ্যহং। মত্তে প্রসবধর্মাণং
 বীজধর্মাণ মেব চ ॥” অর্থাৎ প্রকৃতি ও বিকৃতি সকল হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ মুক্ত
 হইলেও তাঁহাকে আমি প্রসবধর্মা ও বীজধর্মা মনে করি। সাংখ্যেরা
 বলেন প্রসবধর্মা ও বীজধর্মের মূলকারণ ত্রিগুণ, কারণ সমস্ত প্রকৃতি
 বিকৃতি প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিত্যত্মক। দ্রষ্টা সূতরাং কিছুর বীজ ও কিছুর
 প্রসূ নহেন। তিনি কিসের বীজ ও প্রসূ তাহা কাহারও দেখাইবার
 সামর্থ্য নাই।

(২য়) “যদি আত্মা বিশুদ্ধ ও নিশ্চুক্ত ইহা বলনা কর (তাহাও
 ঠিক নহে) কারণ আত্মা থাকিলে প্রকৃতি বিকৃতির অত্যন্ত পরিত্যাগ
 সম্ভব হয় না ; তাহাতে আত্মার স্থিতি থাকিলে প্রকৃতি বিকৃতি ও আত্মা
 এই তিনই সূক্ষ্মভাবে থাকিবে (তত্র সূক্ষ্মমিদং ত্রয়ং)।” সাংখ্যেরা ইহা
 দোষ বা অসঙ্গত মনে করেন না কারণ তন্মতে কিছুর অত্যন্তাভাব নাই।
 প্রলয়ে প্রকৃতি বিকৃতি সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে। তাহাতে দ্রষ্টৃপুরুষের কৈবল্যের
 হানি হয় না। সূক্ষ্ম বা সাম্যাবস্থায় থাকিলে চিত্তবৃত্তি বা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ
 হয় তাহাই দ্রষ্টার কৈবল্য।

(৩য়) “সূক্ষ্মত্বাচ্চৈব দোষণামব্যাপারাচ্চ চেতসঃ। দীর্ঘত্বাদায়ুষশ্চৈব
 মোক্ষস্ত পরিকল্প্যতে ॥” অর্থাৎ দোষ সকলের সূক্ষ্মত্ব হেতু এবং চিত্তের

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্র্যবাদ) (৩৫)

অব্যাপার হেতু অর্থাৎ দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ চিত্ত কিন্তু দোষ বীজযুক্ত থাকাই ঐ (সদোষ) মোক্ষ পরিকল্পিত হয়। সাংখ্যেরা যেরূপ বৌদ্ধদের প্রকৃতি লীনত্ব পর্য্যন্ত গামী বলেন বৌদ্ধেরাও সেইরূপ এই পরিচ্ছিন্নকাল যাবৎ নির্জরত্বকে সাংখ্যের মোক্ষ বলেন। প্রকৃত সাংখ্যযোগ না বুঝার ইহা ফল। দোষের প্রসুপ্তিকে সাংখ্য মোক্ষ বলেন না। প্রান্তভূমি বিবেকের দ্বারা যখন দোষবীজ বা ব্যুত্থান সম্যক্ ক্ষীণ দগ্ধবীজকল্প হইয়া চিত্তের প্রতিপ্রসব বা পুনরুত্থান হীন লয় সম্পাদন করে তখনই সাংখ্যের মোক্ষ। ইহা প্রতিজ্ঞামাত্র নহে কিন্তু সম্যক্ যুক্তিযুক্ত দৃষ্টি। প্রান্তভূমি বিবেকের পর কিরূপে বৃত্তি উঠিবে তাহা বৌদ্ধ বা কেহ দেখাইতে পারিলে তবেই তাঁহাদের কথা আশ্রয় হইবে।

(৩র্থ) “অহংকার পরিত্যাগো বশেষ পরিকল্প্যতে। সত্যাত্মনি পরিত্যাগো নাহংকারস্ত বিঘতে ॥” অর্থাৎ আত্মা থাকিতে অহংকার পরিত্যাগ সম্ভব নহে। ইহা শকার্থের প্রভেদমূলক ব্রান্ত যুক্তি। বৌদ্ধেরা যাহাকে আত্মা বলেন আর্ষ সম্প্রদায়েরা তাহাকে আত্মা বলেন না। বৌদ্ধদের আত্মা সাধারণ আত্মভাব আর আর্ষদের আত্মা—সাধারণ আত্মভাবও বটে এবং তাহার নির্বিকার মূলও বটে। বৌদ্ধেরা বিজ্ঞানের মৌলিক বিশ্লেষ করেন নাই সাংখ্যেরা তাহা করিয়া দেখান যে নির্বিকার দ্রষ্টা ও ত্রিগুণ তাহার কারণ, সুতরাং আর্ষেরা ঐ মূল আত্মভাবকেও আত্মা (বিশুদ্ধ আত্মা) বা পুরুষ বলেন। অহংকারও ত্যাগ করিলে ঐ বিশুদ্ধ আত্মভাবরূপ মূল হেতু না থাকার কোন হেতু নাই অথবা কেবল্যে ঐ শুদ্ধ আত্মা থাকিলে অহংকারাদি কার্য লীন হওয়াতে কোন বাধা নাই। কুণ্ডল বলয় না থাকিলে স্বর্ণকার ও স্বর্ণ থাকিবে না এরূপ দৃষ্টি যুক্ত নহে। অহংকার অনায়ে আত্মত্ব খ্যাতিবিশেষ তাহা সম্যক্ ত্যাগ করিলে ত্যাগকর্তা কেবল থাকিবেন। তিনি সাধারণ আমিত্বের মূল বলিয়া প্রকৃত আত্মা। বলিতে পারি ত্যাগ শেষ হইলে “ত্যাগ কর্তাও” থাকিবে না। ইহা সত্য

কথা কিন্তু বলিতে হইবে ত্যাগের 'অকর্তা-হেতু' তখন থাকিবে । সাংখ্যেরা তাহাই বলেন ।

(৫ম) “সংখ্যাদি গুণ হইতে পুরুষ মুক্ত নহেন বলিয়া তিনি নিগুণ নহেন, আর নৈগুণ্য সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাঁহার মোক্ষও সিদ্ধ হয় না ।” সাংখ্যমতে পুরুষ নিগুণ । নিগুণ অর্থে তিন গুণের বিপরীত এবং গুণ বা ধর্মধর্মিতাবহীন । এখানে শেষোক্ত অর্থেই নিগুণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । সাংখ্যসূত্রে আছে “নিগুণত্বান চিদ্রম্মা” অর্থাৎ পুরুষ বা দ্রষ্টাই চিৎ কিন্তু চৈতন্য তাঁহার ধর্ম বা গুণ নহে । সাধারণ গুণ-গুণী বা ধর্ম-ধর্মী ভাব বিকারশীল অনিত্য দ্রব্যের স্বভাব । বহু গুণের সমাহারকে সাংখ্যেরা গুণী বলেন । লোক-ব্যবহারও সেইরূপ । অখণ্ড-একস্বরূপ দ্রষ্টা সেরূপ গুণসমাহার নহেন । কিন্তু সাধারণতঃ সমস্ত পদার্থকে আমরা গুণসমাহার রূপেই ব্যবহার করি । গুণ কিন্তু প্রকৃত ও বৈকল্পিক । সগুণ দ্রব্য প্রকৃত গুণের সমাহার ; নিগুণ দ্রব্যকেও লক্ষিত করিতে হইলে ব্যবহারবশে গুণ সমাহার-রূপেই করিতে হয় কিন্তু সেশ্বলে সেই গুণসকল অবাস্তব বৈকল্পিক । যেমন পুরুষের অনাদিত্ব, অনন্তত্ব, বহুত্ব প্রভৃতি যে সব গুণ দিয়া লক্ষণা বক্তব্য হয় তাহার সব বৈকল্পিক । আদির অভাব, অন্তের অভাব দ্রষ্টার বাস্তব গুণ নহে বহুত্বও কোন এক দ্রষ্টার বাস্তব গুণ নহে । এইরূপ বৈকল্পিক জ্ঞানবাচী শব্দ ব্যবহার না করিলে ভাষা-ব্যবহার সম্ভব হয় না । তাহা জানাইয়া তবেই সাংখ্য ঐরূপ বৈকল্পিক অবাস্তব গুণের দ্বারা দ্রষ্টাকে লক্ষিত করেন কিন্তু তাহার ফলিতার্থ নিগুণত্ব । এখানে পূর্বপক্ষ বহুত্বাদিকে বাস্তব গুণ ধরিয়া পুরুষকে সগুণ করিয়াছেন এবং তাহাতে “তাঁহার” মোক্ষ অসিদ্ধ মনে করিয়াছেন । বস্তুত সাংখ্যেরা “পুরুষের মোক্ষ” বলেন না বুদ্ধিরই মোক্ষ বলেন । পুরুষের কৈবল্য বলেন । সাংখ্যেরা দ্রষ্টাকে নিত্য মুক্তস্বভাব বলেন । মুক্ত অর্থে দুঃখমুক্ত । দ্রষ্টাতে যে দুঃখ (বা সুখ) নাই চিত্তেই যে তাহা আছে— তাহা খুব স্পষ্ট কথা এবং সাংখ্যশাস্ত্রে বিশদ করিয়া দেখান হয় ।

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্র্যবাদ) (৩৭)

(৬ষ্ঠ) “প্রাগ্‌দেহান ভবেদেহী প্রাগ্‌গুণেভ্য স্তথা গুণী । কস্মাদাদৌ বিমুক্তঃ সন্ শরীরী বধ্যতে পুনঃ ॥” অর্থাৎ দেহের পূর্বে দেহী থাকিতে পারে না, গুণের পূর্বেও গুণী থাকিবে না । দেহী প্রথমে বিমুক্ত থাকিলে কিরূপে পুনরায় বদ্ধ হন ? অর্থাৎ শঙ্কা হইতেছে দেহ না থাকিলে দেহী থাকিবে না অতএব দেহের পূর্বেকার আত্মা দেহী নহেন । আর দেহী বা আত্মা যখন বিমুক্ত তখন আবার বদ্ধ হন কিরূপে ?

এইরূপ শঙ্কার মধ্যে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে । দেহ কবে ছিল না ? সাংখ্য বৌদ্ধ সকলেই ত বলেন দেহ-পরম্পরা অনাদি । স্মৃতরাং “প্রাগ্‌-দেহাৎ” এই বাক্য অর্থহীন । ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালস্থ গুণ সকলের সমাহারকেই সাংখ্যেরা গুণী বলেন । অতীত ও অনাগত গুণ অসংখ্য স্মৃতরাং অতীত গুণের আদি নাই । অতএব “প্রাগ্‌গুণেভ্যঃ” বাক্য নিরর্থক ।

শঙ্কার তৃতীয় অংশ “শরীরী” শব্দ লইয়া । শরীরী অর্থে যাহার শরীর । আত্মার উপর ষষ্ঠী ব্যপদেশ করিয়া তাঁহাকে কথায় শরীরী বলা হয় । আবার তাঁহাকে স্বরূপত অশরীরীও বলা হয় । “আত্মা বদ্ধ হন” ইহা উপচারিক কথা । প্রকৃত কথা “সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ” । ইহাই সাংখ্যমত । রাজ্য না থাকিলে রাজা থাকিবে না একথা যেমন একদিকে সত্য উহাও তেমনি । ক রাজ্যের ঋ রাজা । রাজা হইবার পূর্বেও ঋ ছিল, এবং ক রাজ্য নষ্ট হইয়া যাইলে ঋ রাজা থাকিবে না বটে কিন্তু রাজ্যহীন ঋ থাকিবে । শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে বা না থাকিলে কথায় আত্মাকে বদ্ধ বা মুক্ত বলা যায় তাহাতে আত্মার কিছু আসিয়া যায় না । শরীর না থাকিলে দেহ হীন আত্মা থাকিবেন ।

(৭ম) “ক্ষেত্রজ্ঞো বিশরীরশ্চ জ্ঞো বা শ্রাদজ্ঞ এব বা । যদি জ্ঞো ক্ষেত্রমস্যাশ্চি জ্ঞেয়ে সতি ন মুচ্যতে ॥ অথাজ্জ ইতি সিদ্ধো বঃ কল্পিতেন

কিমান্না।” অর্থাৎ বিশরীর ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞ কি--অজ্ঞ? যদি জ্ঞ বা জ্ঞাতা বল তবে ইহার জ্ঞেয় থাকিবেই, আর তাহা থাকিলে মুক্ত কিরূপে হইবে? আর যদি অজ্ঞ বল তবে কাষ্ঠাদি জড় পদার্থের দ্বারাও জ্ঞান সিদ্ধ হইবে আত্মার কল্পনার ফল কি?

এখানেও পূর্বোক্ত ভ্রান্তি। রাজা ও রাজ্যের উদাহরণ এখানেও খাটিবে। জ্ঞ অর্থে জ্ঞাতা। জ্ঞাতা অর্থে যিনি জানেন। জানা দ্বিবিধ নিজেকে নিজে জানা—ও অন্তকে জানা। সাংখ্যেরা ঐ প্রথম জানাকে জ্ঞাতার স্বরূপ বলেন উহাই পুরুষের লক্ষণ। দ্বিতীয় প্রকার জানা ঐ স্বপ্রকাশরূপ নির্বিকার হেতু হইতে সিদ্ধ হয় বলিয়া (বুদ্ধি পুরুষের সংযোগে সিদ্ধ হয় বলিয়া) উহাকেও গ্রহীতা নামক জ্ঞাতা বলা হয়। কিন্তু এই জ্ঞাতা বা গ্রহীতা প্রকৃত স্বপ্রকাশ জ্ঞাতার মত বলিয়াই (আমি আমাকে জানছি এরূপ অনুভূতিই স্বপ্রকাশের মত জানা) জ্ঞাতা বা ব্যবহারিক জ্ঞাতা বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। এই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞাতারই জ্ঞেয় থাকে এবং জ্ঞেয় থাকিলেই তাহা অকেবল হয়। জ্ঞেয় রুদ্ধ হইলে এই অকেবল জ্ঞাতৃত্বও রুদ্ধ হয় স্বপ্রকাশ জ্ঞাতাই কেবল থাকেন। যেমন ক রাজ্য গেলেও খ রাজার স্বরূপহানি হয় না তদ্রূপ। ইহাই সাংখ্যীয় যুক্তিযুক্ত দৃষ্টি।

(৮ম) “পরতঃ পরত স্ত্যাগো বস্মাত্তু গুণবান্ স্মৃতঃ। তস্মাৎ সৰ্বপরিত্যাগান্মত্তে কুৎস্নাং কৃতার্থতাম্ ॥” অর্থাৎ পর পর ক্রমে (বিষয়, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার আদি ক্রমে) ত্যাগ যখন উত্তরোত্তর গুণবান্ বা ভাল তখন সমস্ত ত্যাগকেই আমি সম্যক্ কৃতার্থতা মনে করি। এইরূপে সব শূন্য বা কিছু না থাকাই কৃতার্থতা। আত্মগ্রাহ কৃতার্থতা নহে।

এই সিদ্ধান্তে কিন্তু একটা মহতী শঙ্কা আসে। ত্যাগ করে কে এবং কি বা ত্যাজ্য? ত্যাগকর্তা বা হাতা হয় ভাবকে ত্যাগ করিতে করিতে হয় ভাবের সম্যক্ ত্যাগ হইলে শেষে হাতা নিজেই থাকিবে, কারণ

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্র্যবাদ) (৩৯)

নিজেকে নিজে কিরূপে ত্যাগ করিবে? অতএব হাতা তখন স্বরূপস্থ ও কেবল থাকিবেন ইহাই এবিষয়ে যুক্তিযুক্ত কথা। সাংখ্য তাহাই বলেন। ‘শূন্য থাকিবে’ বা ‘কিছু না’ থাকিবে এরূপ অসঙ্গত ভাষা যাহা শূন্যবাদীদের প্রয়োগ করিতে হয় সাংখ্যদের তাহা করিতে হয় না।

নির্বাণ যে শূন্য অসৎ তাহা বৌদ্ধেরা এইরূপে দেখান :—ধর্মকীর্তি বলেন (অন্য অনেকেও বলেন) “যৎ সৎ তদনিত্যং যথা ঘটাদিঃ”(ন্যায়বিন্দু) অর্থাৎ যাহা সৎ তাহা সব অনিত্য যেমন ঘটাদি। ইহা হইতে বৌদ্ধেরা যুক্তি করেন যে “নির্বাণ নিত্য অতএব তাহা অসৎ” *। ইহার অগ্ৰাঘাতা স্পষ্টই প্রতীত হয়। বিপরীত প্রতিজ্ঞা বা converse সর্বস্থলে সত্য হয় না। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে, যথা :—যাহা অসৎ বা নাই তাহা বাতুলেরাই চাহিতে পারে, নির্বাণ অসৎ, অতএব তাহা বাতুলেরই প্রার্থনীয়। ফলে যাহা সৎ তাহা অনিত্য এই প্রতিজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত নহে। সতের সহিত অনিত্যতারই যে সম্বন্ধ আছে তাহা যুক্তিহীন কথা। নিত্য দ্রব্যও সৎ। যাহা আছে তাহাই সৎ। অনিত্য দ্রব্যও আছে নিত্য দ্রব্যও আছে অতএব উভয়ই সৎ। যাহা প্রত্যয়োৎপন্ন তাহাই ভাব বা সৎ এইরূপ পারিভাষিক সৎ শব্দ বৌদ্ধদের অভীষ্ট হইলে তাহাতে কিছু বক্তব্য নাই। পরিভাষা করিয়া যে কোন শব্দ যে কোন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সাংখ্যদের দ্রষ্টা পুরুষ স্বপ্রকাশ। দৃশ্য প্রকাশ্য। দৃশ্যবর্গে স্বপ্রকাশের উদাহরণ নাই। সূর্য্য, অগ্নি আদির উপমা দেওয়া হয় বটে কিন্তু উহার স্বপ্রকাশ নহে, কিন্তু চক্ষুঃপ্রকাশ্য। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে সম্যক্ বিরুদ্ধ তাই দৃশ্যে স্বপ্রকাশিত্ব পাওয়া সম্ভব নহে। ইহা না বুঝিয়া

* জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু এইরূপ গ্ৰায় প্রয়োগ আমাদেরকে লিখিয়া-
ছিলেন।

কোন কোন বাদী বলেন স্বপ্রকাশ দ্রব্য নাই। দার্শনিক বিষয় উদ্ভব-রূপে আরম্ভ না হওয়াই এইরূপ ভ্রান্তির কারণ।

সকলেই অনাদি, অনন্ত, নির্বিকার আদি শব্দ ব্যবহার করেন এবং উহার দ্বারা সত্য অবধারণ করেন (বৌদ্ধেরা বলেন লোকধাতু, বুদ্ধের জ্ঞান প্রভৃতি অনন্ত, সংসার অনাদি ইত্যাদি)। কিন্তু অনাদিত্ব অনন্তত্ব নির্বিকারত্ব দৃশ্য বর্গে কোথায় আছে? যাহা দেখিতেছ বা জানিতেছ তাহা সদাই সাদি, সান্ত ও বিকারী। তথাপি ঐ কথা ব্যবহার কর কেন? করিতে হয় বলিয়া। “শেষ বা অন্ত” আমাদের অনুভূয়মান পদার্থ। কিন্তু এরূপ স্থল ‘আছে’ যথায় ‘শেষ’ কল্পনীয় নহে। তথায় অগত্যা ‘অ-শেষ’ পদ উচ্চ মানবকে ব্যবহার করিতে হয় এবং দর্শন-বিজ্ঞানের অনেক উচ্চতম সত্য ঐরূপ বৈকল্পিক পদের যোগে আমাদের বুঝিতে হয়। সেইরূপ বস্তু প্রকাশ বা জ্ঞান আছে তাহাতে সর্বদাই প্রকাশ-প্রকাশক ভাব (subject and object) থাকে। ইহা অনুভূয়মান তথ্য। প্রকাশ-প্রকাশক ভাব ছাড়া কোন জ্ঞান ব্যবহার জগতে নাই। ব্যবহারিক বা empiric জগতের জ্ঞানে সর্বস্থলেই মনে হয় ‘আমি’ জ্ঞাতা অমুকভাব জ্ঞেয়। প্রকাশ-প্রকাশক যোগে এই যে প্রকাশ তাহা সহৈতুক বা conditioned প্রকাশ। সহৈতুক ভাবের হেতু চাই। বলিতে পার প্রকাশ ও প্রকাশক এই দুইএর যোগই হেতু। যোগ হইতে গেলে অন্তত দুই দ্রব্য চাই। এ স্থলে ঐ দুই দ্রব্য কি হইবে? উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে তাহারা অহৈতুক প্রকাশক ও অহৈতুক প্রকাশ। সহৈতুক বিজ্ঞানকে বিশ্লেষ করিয়া এইরূপে যে অহৈতুক দুই পদার্থ লাভ হয় তাহাই সাংখ্যের স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা ও প্রকাশ মূল দৃশ্য ত্রিগুণ। বৌদ্ধেরা বলেন “নহি চিন্তং চিন্তং সমনুপশ্চতি। তত্তথা ন তয়েবাসিধারয়া সৈবাসিধারা শক্যতে ছেত্তুং” (আৰ্য্যবল্লভ সূত্র) অর্থাৎ চিন্তা চিন্তকে জানিতে পারে না যেমন অসিধারার দ্বারা সেই অসিধারা ছেদ করা যায় না সেইরূপ।

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্র্যবাদ) (৪১)

সাংখ্যেরাও বলেন চিত্ত স্বাভাস নহে। বৌদ্ধেরা উহা হইতে সিদ্ধান্ত করেন স্বসংবেদন বা স্বপ্রকাশ নাই। সাংখ্যেরা ঐ যুক্তিতেই বলেন চিত্ত যখন স্বসংবেদনরূপ নহে তখন তাহা সংবেদ্য বা 'পরপ্রকাশ'। সেই 'পর' অগত্যা স্বপ্রকাশরূপ হইবে। ("স্বসংবেদ্য নহে" এরূপ বাক্যের একমাত্র অর্থ—"পরসংবেদ্য")। নচেৎ অনবস্থা বা regressus ad infinitum নামক দোষ আসিবে।

শান্তিদেব, শান্তিরক্ষিত প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিকদের একটি প্রিয় যুক্তি এই যে আত্মা "জ্ঞানস্বরূপ"। নিরোধকালে জ্ঞেয় রোধ হয়। কিন্তু জ্ঞেয় ব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে না (জ্ঞেয়ং বিনা তু কিং বেত্তিষেন জ্ঞানং নিরুচ্যতে। শান্তিদেব) অতএব নিরোধকালে জ্ঞানস্বরূপ আত্মাও থাকে না। ইহাও সাংখ্য সমাকৃ না বুঝার ফল। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ইহা টিলা কথার লোকে (বিশেষত বেদান্তীরা) বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ জ্ঞান জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয় এই ত্রিপুটীভাবযুক্ত জ্ঞান নহে কিন্তু উহাদের মূলীভূত স্বপ্রকাশ জ্ঞ নামক 'জ্ঞান'। স্বরূপ জ্ঞাতা বা চিত্ত, সাধারণ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই চারিপ্রকার পদার্থ সাংখ্য বলেন, তাহাদের ভেদ না বুঝাতেই এরূপ দোষ কল্পিত হয়। সাংখ্য বলেন নিরোধে সাধারণ জ্ঞাতা বা গ্রহীতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই তিনেরই রোধ হয় বটে কিন্তু স্বরূপ জ্ঞাতা, যাহার প্রতিচ্ছায়া সাধারণ জ্ঞাতা, তাহার রোধ হয় না। সাধারণ আমিত্ব হেতুজ্ঞাত ভাব। ভাবের অভাব অচিন্তনীয় অদার্শনিক কল্পনা। সুতরাং আমিত্বের সং হেতু তখন বর্তমান থাকে এবং উপাদান ত্রিগুণও থাকে। শান্তিরক্ষিতের (তৎসংগ্রহ, আশ্র্য পরীক্ষা) এক যুক্তি (স্বচৈতন্যের বিরুদ্ধে) এই "তত্রাপি রূপ শব্দাদি-চেতসাং বেদ্যে কথম্। সুব্যক্তং ভেদবক্রপমেকা চেচ্চৈতনেষ্যতে ॥" অর্থাৎ চৈতন্য যদি একস্বরূপ হয় তবে রূপশব্দাদি জ্ঞান, যাহারা প্রত্যক্ষত বহুরূপ, তাহাদের বহুত্ব হয় কিরূপে? এই যুক্তির সারবত্তা অতি

অন্ন । সাংখ্যেরা বলেন চিত্তেতেই ভেদ ; পুরুষে বা তচ্ছায়াভূত জ্ঞাতৃত্বে ভেদ নাই । উদাহরণ যথা :—একই আমি বহু জ্ঞানের জ্ঞাতা । সুখ দুঃখ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু তাহার জ্ঞাতা একই আমি, ইহা প্রত্যক্ষত অনুভূত হয় । উপমা যথা :—একই আলোকের দ্বারা যেমন বহুবর্ণের বহুদ্রব্য প্রকাশিত হয় তদ্রূপ । সেইরূপে “নানাবিধার্থভোকৃত্ব ও” সিদ্ধ হয় ।

ভোকৃত্ব অর্থে সাংখ্যে সুখদুঃখের সাক্ষিত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব । এক আমি যে বহুর জ্ঞাতা ইহা প্রত্যক্ষানুভূতি । সাংখ্যের প্রকৃত দৃষ্টি না বুঝিয়া শাস্ত্ররক্ষিত আরও কতকগুলি ব্যর্থ যুক্তি দিয়াছেন । যথা পুরুষের দিদ্ক্ষা হইতে যদি ভোগ হয় বল তবে পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ হন না দিদ্ক্ষায়ুক্তও হন ; আর দিদ্ক্ষা, উদয়-বায়-যুক্ত সূতরাং পুরুষ ও তাদৃশ হন । দিদ্ক্ষা মনের বৃত্তি, পুরুষের স্বভাব নহে ইহা সাংখ্য মত ; অতএব এই দোষ স্বকল্পিত ; সাংখ্যের সহিত উহার সম্বন্ধ নাই । সেইরূপ “অভিলাষানুসারেণ প্রকৃতিশ্চেৎ প্রবচ্ছতি” এ শব্দাও কল্পিত । অভিলাষও সাংখ্যমতে মনের ধর্ম, পুরুষের নহে । বৌদ্ধেরা পশু ও অন্ধের উপমাও সর্বাংশগ্রহণরূপ দোষ করিয়া থাকেন । টীকাকার কমলশীল বলেন “তো চ সদা সন্নিহিতাবিতি । অতো নিত্যমেব ফলং ভবেৎ ।” স্পষ্টই ইনি পুষ্প্রকৃতির সন্নিধান অর্থে দৈশিক সন্নিধান বুঝিয়াছেন । দেশকালাতীত পদার্থের ওরূপ সন্নিধান যে অসম্ভব তাহা বলা বাহুল্য । অবিবিক্ত জ্ঞান বা একপ্রত্যয়ান্তর্গততাই ঐ সন্নিধান । সূতরাং তাহার বিরুদ্ধ বিবেক হইতেই সেই সন্নিধান দূর হয় ও সুখ-দুঃখভোগ নষ্ট হয় ইহাই সাংখ্য সিদ্ধান্ত । শব্দকেরা ইহার কিছুই বুঝেন নাই ।

পুরুষের ভোকৃত্ব সম্বন্ধেও সেই কথা । শব্দকেরা মনে করেন “ভোকৃত্ব” অর্থে বিক্রিয়া বিশেষ সূতরাং পুরুষ বিকারী অতএব “নিত্য” নহে । “বিক্রিয়ায়াশ্চ সদ্ভাবে নিত্যত্বাদবহীয়াতে” । (তত্ত্ব সং ২৯৫) । সাংখ্য

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্রয়বাদ) (৪৩)

মতে ভোক্তৃত্ব অর্থে সাক্ষিত্ব বা বিজ্ঞাতৃত্ব (যোগভাষ্য দ্রষ্টব্য)। “ন হি বিজ্ঞাতু বিজ্ঞাতে বিপরিলোপো বিদ্যতে” তজ্জন্ম মূল বিজ্ঞাতা নির্বিকার। তিনিই বিজ্ঞানের নির্বিকারমূল। আর “অর্থোপভোগকালে চ যদি নৈবাস্ত্র বিক্রিয়া। নৈব ভোক্তৃত্বমশ্রু শ্রাৎ প্রকৃতিশ্চোপকারিণী ॥” (তত্ত্ব সং২৯৪) অর্থাৎ অর্থোপভোগকালে যদি পুরুষের বিক্রিয়া না হয় তবে উহার ভোক্তৃত্বই সিদ্ধ হয় না আর প্রকৃতিও উহার উপকারিণী হইতে পারে না।

ভোক্তৃত্ব অর্থে সুখ দুঃখ বুদ্ধির প্রতिसংবেদিত্ব (কারণ সাংখ্য মতে “বুদ্ধেঃ প্রতिसংবেদী পুরুষঃ”)। নির্বিকার পুরুষ তাহার হেতু বলিয়া ভোক্তা। এরূপ ভোক্তৃত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না তাহার কিছু যুক্তি নাই। নির্বিকার দ্রব্য দৃশ্যবর্গে নাই সূত্রাৎ এবিষয়ের উদাহরণ হইতে পারে না। উপমা এইরূপ—একটা কৃষ্ণবর্ণ ও একটা শ্বেতবর্ণ দ্রব্য অন্ধকার হইতে সূর্যালোকে স্বকীয় গতিশক্তির দ্বারা যাইয়া প্রকাশিত হইল। এ স্থলে সূর্য প্রকাশক হইলেও যেমন তাহাতে সূর্যের বিক্রিয়া হয় না ঐ দ্রব্যদ্বয়ই প্রকাশিত অপ্রকাশিত হয় এবং সূর্যের প্রকাশকত্বকে খ্যাপিত করে সেইরূপ সুখ ও দুঃখরূপ জড়বুদ্ধি ক্রিয়াশীল স্বভাবে উখিত হইয়া নির্বিকার পুরুষের দ্বারা “আমি সুখী” “আমি দুঃখী” এইরূপে প্রকাশিত হয়। মনে রাখিতে হইবে আমাদের ভাষা সহৈতুক (বৌদ্ধ ভাষায় ‘কৃতক’) পদার্থ লইয়া হয়। অহৈতুক বা unconditioned পদার্থ উহার দ্বারাই আমাদের ভাষিত করিতে হয় (সহৈতুকত্ব নিষেধ করিয়া)। তাহা বিশ্বিত হইয়া শঙ্করদের দ্বারা এই সব গ্ৰায়াভাস কল্পিত হইয়াছে।

প্রথমে সাধ্য—নির্বিকার জ্ঞ পদার্থ। তাহা সিদ্ধ হইলে তাহাকে বিবক্ষানুসারে যে সব ভাষা প্রয়োগ করিয়া লক্ষিত করা হয় তাহাদেরকে অহৈতুকত্ব নির্বিকারত্ব “আদি অর্থে বুঝিতে হইবে। ‘ভোক্তৃত্ব’ শব্দও সেইরূপ নির্বিকারজ্ঞাতৃত্ব অর্থেই সাংখ্যেরা ব্যবহার করেন “আমি সুখী”

“আমি দুঃখী” এরূপ বিকারী ভাবের উহা সংজ্ঞা নহে। তাদৃশ আমিহের সংজ্ঞা ‘গ্রহীতা’। কোন পদার্থকে ‘অনন্ত’ বলিলে কেহ দোষ ধরিতে পারে অন্তই ত দেখিতেছি অনন্ত দেখি না অতএব উহা নাই। নির্বিকার ভোক্তা আদি পদার্থ সম্বন্ধেও ঐরূপ দোষ যে কল্পিত হইয়াছে তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তির অন্ধান করিলেই বুঝিবেন। অন্তের অভাব না দেখিলেও যেমন আমাদেরকে স্থলবিশেষে অনন্ত পদ ব্যবহার করিতে হয় (দর্শন বিজ্ঞানে), সেইরূপ ব্যবহারিক জ্ঞানকে বিকারি দেখিলেও উহার অহেতুক বিকারী উপাদান ও নির্বিকার নিমিত্ত কারণরূপ জ্ঞ বা চৈতন্য স্বীকার করিতে হয়।

সমস্ত আত্মবাদীদের একটি প্রধান যুক্তি ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ ‘সেই আমি এই’ বা ‘যে আমি দেখিয়াছিলাম সেই আমি শুনিতেছি’ ইত্যাদিকার একত্ব-অনুভূতিই প্রত্যভিজ্ঞা। কুমারিল ভট্ট শ্লোকবার্ত্তিকে বলিয়াছেন “তেনাস্মাৎ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ সৰ্বলোকাবধারিতাৎ । নৈরাত্ম্যবাদবাধঃশ্রাৎ”। আমি ছিলাম, আমি থাকিব এই সব অনুভূতিতে (যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ) আমি এক বলিয়াই অনুভূত বা প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। অতএব আমিহের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সৰ্বাবস্থাতেই এক থাকে এবং তাহাই চিদ্রূপ আত্মা। আত্মবাদের প্রত্যভিজ্ঞামূলক সংক্ষেপ যুক্তি এইরূপ।

বৌদ্ধদের মতে সমস্ত ক্ষণিক। আত্মভাব ক্ষণে ক্ষণে উঠিতেছে ও লয় পাইতেছে। পূর্বক্ষণিক ও পরক্ষণিক আত্মভাব অসম্বন্ধ পৃথক্ দ্রব্য। ইহাতে আত্মবাদীরা যে দোষ দেখান তাহা এস্থলে উল্লেখ না করিলেও চলিবে। বৌদ্ধেরা প্রত্যভিজ্ঞাবাদ বিরূপে খণ্ডন করেন তাহাই দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধেরা নিম্নস্থ থিওরী বা উপপত্তিবাদের দ্বারা উহা খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান। তাঁহারা বলেন ঐ যে একত্বজ্ঞান—যাহার স্বরূপ ‘সেই আমি এই’ এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা—তাহা ভ্রান্তিমাত্র। আরও বলেন (কমলশীল) প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণ নহে। প্রত্যভিজ্ঞা যে প্রমাণ নহে তাহা সত্য। আত্ম-

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্রয়বাদ) (৪৫)

বাদীরাও উহা বলেন না। উহা অনুমান প্রমাণের অঙ্গ মাত্র। ‘এই সেই’ এরূপ একত্ববোধ হয় দেখা যায়। তাদৃশ অনুভূতি হইতে অনুমান হয় যে ঐ দুই বস্তু এক। ইহাই আশ্রয়বাদীরা বলেন। পূর্বে একজনকে দেখিয়া-ছিলাম পুনরায় তাহাকে দেখিয়া যে প্রমাণে বলি বা নিশ্চয় করি যে ‘এই সেই ব্যক্তি’ আশ্রয়ক্ষেত্রেও সেই হয়।

আশ্রয় একত্ব যাহা সাক্ষাৎ অনুভূত হয় তাহা যে ভ্রান্তিমাত্র তাহার প্রমাণ বোধের দিতে পারেন না। সংশয় উত্থাপন করিতে পারেন মাত্র। তাহা কিন্তু প্রমাণ নহে। ভ্রান্তি হইলে দুইটি সংপদার্থ চাই অর্থাৎ আশ্রয়-বিষয়ক ভ্রান্তিতে একটা পরিবর্তনশীল আশ্রয়ভাব চাই ও একটা অপরিবর্তনশীল আশ্রয়ভাব চাই তবেই ভ্রান্তি হইতে পারে। এইরূপ দুই আশ্রয়ভাব থাকিলে তবেই পরিবর্তনশীলকে অপরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনশীলকে পরিবর্তনশীল বলিয়া ভ্রান্তি হইতে পারে। বোধেরা বলেন তাহা না হইতেও পারে। শান্তরক্ষিত বলেন ‘খ পুষ্প’-জ্ঞানে কিছু সংপদার্থ না থাকিলেও যেমন জ্ঞান হয় বা ‘হস্ত্যাদি শূন্যায়ং ভূমৌ’ যেমন হস্ত্যাতির আরোপ জ্ঞান হয়, সেইরূপ দুই সংপদার্থ না থাকিলেও ভ্রান্তি বা আরোপ হইতে পারে। এই দৃষ্টান্ত সদোষ। হস্তী আদি পূর্বদৃষ্ট সংপদার্থ, ভূমিও সংপদার্থ। হস্তীর স্মৃতি (যাহা সংপদার্থ) উঠিয়া ভূমিতে কল্পনার দ্বারা আরোপিত হয় মাত্র। হস্তীর অত্যন্তাভাব থাকিলে বা পূর্বদৃষ্ট না হইলে কখন হস্তীর স্মৃতি হইতে পারে না। অতএব ঐরূপ ভ্রান্তিদর্শনের (hallucinationএর) জন্মও দুই ভাব পদার্থ চাই। আশ্রয়সম্বন্ধীয় ভ্রান্তিতেও তাহা চাই। শান্তরক্ষিত যে বলেন “জ্ঞাতরি প্রত্যভিজ্ঞানং বাসনা কর্তুমহতি” তাহা সত্য কথা। আশ্রয়বাদীরাও তাহা বলেন। কিন্তু বাসনা বা সংস্কার হইতে হইলে অনুভাব্য সংপদার্থ চাই। আশ্রয়ভাবের একত্ব প্রত্যয় কেন হয় তাহা বোধেরা এইরূপে বুঝাইতে চান :—বিজ্ঞান সন্তান একজাতীয় বলিয়া অর্থাৎ পূর্বক্ষণিক ও পরক্ষণিক বিজ্ঞান একজাতীয় বলিয়া ‘আমি এক’

এরূপ একত্ব ভ্রান্তি হয়। আত্মভাবে জ্ঞাত্বাংশ কিন্তু একজাতীয় বলিয়া অনুভূতি হয় না তাহা এক বলিয়াই অনুভূতি হয়। তবে আত্মভাবে জ্ঞেয়াংশ একজাতীয় বলিয়া অনুভূতি হয়। আত্মবাদীরা জ্ঞাতাকেই এক অবিকারী বলেন জ্ঞেয়কে একজাতীয় সন্তান বলেন (বৌদ্ধদের স্থায়)। বৌদ্ধেরা এইস্থলে ঐ উভয়ের বিবেক করিতে না পারিয়া ভ্রান্তি করেন।

সাংখ্যেরা উপমা দেন “প্রতিবিশ্বোদয়ো যথা স্বচ্ছ চন্দ্রমসোহন্তসি” অর্থাৎ স্বচ্ছ জলে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব হয় সেইরূপ পুরুষে ভোগ উপ-চরিত হয় (বুদ্ধির চেতনতাও সেইরূপ)। প্রতিবিম্ব যেরূপ দর্পণের মধ্যে প্রবেশ করে না, কিন্তু দর্পণমধ্যস্থ বলিয়া বোধ হয় পুরুষের ভোগ ও যে সেইরূপ ইহাই এই উপমার দ্বারা কথঞ্চিৎ বুঝান হয়। বৌদ্ধেরা তাহা না বুঝিয়া উহার সর্বাংশ গ্রহণ করিয়া দোষ ধরেন। “উচ্যতে প্রতিবিশ্বশ্চ তাদাত্ম্যেন সমুদ্ভবে। তদেবোদয়-যোগিত্বং বিভেদে তু ন ভোক্ততা ॥” (তত্ত্ব সং ২৯৮) অর্থাৎ এই প্রতিবিম্ব যদি তাদাত্ম্যরূপে বা পুরুষগতরূপে উদয় হয় তবে পুরুষ উদয়-ব্যয়ধর্মযুক্ত হন, আর উহা বিভিন্ন হইলে পুরুষের ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। সাংখ্য বলেন “ভোগাপবর্গো বুদ্ধিকৃতৌ বুদ্ধাবেব বর্তমানৌ পুরুষে ব্যপদিশ্রুতে।” উহা বিকারকৃত ভোগ নহে বলিয়া—উহা উপচরিত বলিয়া, পুরুষে উহার উপচার হয়—ইহা বলিতে বিন্দুমাত্র দোষ নাই। উপমা (উদাহরণ নহে) লইয়াই এই সব গোল। উপমা (যাহা প্রমাণ নহে) না দিলে অগ্রপক্ষ এসব কিছুই বলিতে পারি-তেন না। যাহাতে বিকার হয় না এরূপ সাক্ষিত্বকেই সাংখ্যেরা ভোগ বলেন।

উদাহরণ (example, simile নহে) হইতে সামান্ত্র নিয়ম (induced law) সিদ্ধ হয়। তাহা লইয়া সামান্ত্রতোদৃষ্ট অনুমানের (inductionএর) দ্বারা অপ্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সত্তা নিশ্চিত হয়। সাংখ্যের ‘সংঘাত পরার্থত্ব’ যুক্তি (পুরুষসিদ্ধিবিষয়ে) ঐরূপ। যাহারা একযোগে মিলিয়া

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্রয়বাদ) (৪৭)

কার্য করে বা ফল দেয় তাহারা উপরিস্থিত এক শক্তির বশেই ওরূপ করে এক প্রযোক্তা না থাকিলে কিরূপে সকলে একযোগে কার্য করিবে ?

এই সংহত্যকারিত্বকে 'উপকার' অর্থ করিয়া শান্তরক্ষিত প্রভৃতি বৌদ্ধেরা সাংখ্যপক্ষ খণ্ডন করার প্রয়াস পাইয়াছেন। উপকরণের কার্য মাত্র যে এস্থলে উপকার তাহা না বুঝিয়া কিন্তু প্রকৃতির উপচিকীর্ষুতা ও পুরুষের উপকারাপেক্ষা বুঝিয়া তাহারা গোল করেন। চক্ষুরাদি বাহ্য করণসকল সংহত্যকারী ; তাহারা উপরিস্থ চিত্তের বা বিজ্ঞানের উপকরণ রূপে সংহত্যকারী। ইহা উভয়পক্ষই স্বীকার করেন। বৌদ্ধেরা বলেন "অবিকার্যুপকারিত্বসাধনে সাধ্যশূন্যতা।" দৃষ্টান্তস্তত্র চলন্তৈব যুক্তান্তেপ্যুপকারিণঃ ॥" (তত্ত্ব সং ৩০১) অর্থাৎ অবিকারীর (বৌদ্ধমতে নিত্যের ; সাংখ্যমতে বিকারী নিত্যও আছে) উপকার হয় যদি বল (সংহত্যকারিত্বের দ্বারা) তাহা হইলে সাধ্য যে অবিকারিত্ব তাহা থাকে না ; কারণ শয্যাসনাদি চল বা অনিত্য দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহারা যে অনিত্যের উপকারী তাহাই সিদ্ধ হইবে—তদতিরিক্ত নিত্য কোন আধেয় পদার্থ সিদ্ধ হইবে না।

এই যুক্তির দোষ এইরূপ—অনিত্য পদার্থের দৃষ্টান্তের দ্বারা এখানে নিত্য পদার্থ সিদ্ধ করা হইতেছে না, (যদিচ অনিত্যের তুলনায় আমরা নিত্যের অভিকল্পনা করি) কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে যে এক উপরিস্থ পর থাকিবে তাহাই এস্থলে সাধ্য। সেই পর ওপারস্থ এবং বিজ্ঞান অব্যবস্থ বা এপারস্থ। অতএব সেই পর অনিত্য-বিজ্ঞানের লক্ষণক হইবে না, নিত্যলক্ষণক হইবে। তাহা নিষ্কারণ বলিয়া নিত্য। তাহার নিবি'কারিত্ব অন্তরূপে সাধ্য। কার্য অপেক্ষা কারণ আপেক্ষিক নিত্য। মূল কারণ তজ্জগৎ পূর্ণ নিত্য। যাহা বরাবর আছে তাহা নিত্য। অনিত্যতা বা ক্রিয়াশীলতা (অবস্থান্তরতা) বরাবর আছে অতএব তাহাকে সাংখ্য পরিণামনিত্যতা বলেন। সংহত্যকারী ও পরিণামী বিজ্ঞানের 'পর' যে 'শুদ্ধ'

বিজ্ঞাতা তাহা পরিণামি-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধত্বহেতু অপরিণামী। বিজ্ঞানের সংহত্যকারিত্ব বিষয়ে কমলশীল যে যুক্তি দেন তাহা এই—“চিত্তশ্চ চানেক- কারণ ক্রতোপকারোপগ্রহেণোৎপত্তেঃ সংঘাতত্বং কল্পিতমশ্বেবেতি হেতোঃ”। চিত্ত অনেক কারণকৃত উপকার উপগ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার সংঘাতত্ব সিদ্ধ হয়। সাংখ্য বলেন সেই অনেক কারণ একযোগে সমঞ্জস- ভাবে কার্য করিয়া যখন এক চিত্ত (জ্ঞান ইচ্ছাদি) উৎপাদন করে তখন ঐ সংস্কারাদি কারণ সকলের উপরে এক শক্তি থাকিবে। তাহাই দৃশ্যের পরপারস্থ পুরুষ। সেই একস্বরূপ স্বচৈতন্য পদার্থের পৃষ্ঠস্থতাতেই ‘আমি অবিভাজ্য এক’, ‘আমি আমাকে জানি’, ‘সেই আমি এই’ ইত্যাদি অখণ্ড একত্বের, স্বপ্রকাশের, নির্বিকারত্বের লিঙ্গ আমিত্ববোধে পাওয়া যায়। আবার বহুসমষ্টিতা, জ্ঞেয়তা ও পরিবর্তনশীলতাও পাওয়া যায়। তাই সাংখ্য বলেন নিত্য, নির্বিকার, স্বপ্রকাশ পদার্থ এবং নিত্যবিকারী প্রকাশ্য পদার্থ এই দ্বিবিধ পদার্থের দ্বারা আমিত্ব নিশ্চিত। বৌদ্ধ এই প্রকৃত যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারেন নাই। অতএব বৌদ্ধ যে বলেন ইন্দ্রিয় হইতেই জ্ঞান সিদ্ধ হয় চৈতন্য কল্পনা বার্থ তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। বৌদ্ধ বলেন “চৈতন্যে চাত্মশব্দশ্চ নিবেশেহপি ন নঃ ক্ষতিঃ। নিত্যত্বং তশ্চ ছুঃসাধ্যম্ অক্ষ্যাদেঃ সফলত্বতঃ ॥ অক্ষ্যার্থাণ্যফলং তু শ্রাচৈতন্যং শাস্বতং যদি। ন ভবেদিহনেনার্থো যদি শ্রাৎ শাস্বতোহনলঃ ॥” (ভব্ব সং ৩০৫-৬) অর্থাৎ চৈতন্যে আত্মশব্দের নিবেশে আমাদের ক্ষতি নাই। তবে (আমরা বলি) তাহার নিত্যত্ব ছুঃসাধ্য; কারণ তাহা নিত্য হইলে অগ্নি আদি সফল (জ্ঞান জননে) হয় না। চক্ষুরাতির অর্থ অফল হয় যদি চৈতন্য শাস্বত হয়। যদি অনল শাস্বত হয় তবে আর কাঠে প্রয়োজন কি? ইহা অতীব অযুক্ত কথা। অনল ও ইন্ধনে যে সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ে ও চৈতন্যে সে সম্বন্ধ নহে। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান চৈতন্য নহে। বৃষ্টি হইতেই জল পাওয়া যায় অতএব জলের জন্ম সমুদ্রে ও সূর্য্যে প্রয়োজন কি? মৃত্তিকা যদি শাস্বত

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্র্যবাদ) (৪৯)

হয় তবে ঘটে প্রয়োজন কি ? এই সব যেমন অযুক্ত কথা ঐ দৃষ্টান্তও তদ্রূপ । চৈতন্য ও ত্রিগুণ ইন্দ্রিয়ের হেতু ও উপাদান তাই শাস্ত্রত চৈতন্যের ও শাস্ত্রত প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতির প্রয়োজন ।

মাধ্যমিকেরা কিছুকে অস্তিত্ব বলিতে চান না নাস্তিত্ব বলিতে চান না । সেইরূপ না বলাই তাঁহারা মধ্যম পথ মনে করেন ও তাহাই যুক্ত মনে করেন (অন্ত সর্বাশ্রিতবাদী বৌদ্ধেরা সেইরূপ নহেন) । কিন্তু যখন অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ব্যতীত কথা বলা চলে না তখন কথা না বলাই তাঁহাদের সম্যক্ দর্শন হওয়া উচিত । মধ্যমককারিকায় নাগার্জুন বলিয়াছেন “কাত্যায়নাববাদে চাস্তীতি নাস্তীতি চোভয়ং । প্রতিষিদ্ধং ভগবতা ভাবা-ভাব বিভাবিনা ।” (১৫।৭) অর্থাৎ ভগবান্ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব উভয়ই প্রতিষেধ করিয়াছেন । অবশ্য ইহা আগমের কথা স্মরণে দর্শনে অগ্রাহ্য । তাই নাগার্জুন যুক্তি দেন “যথাস্তিত্বং প্রকৃত্যা স্মার ভবেদস্য নাস্তিতা । প্রকৃতেঃ অন্তথাভাবো ন হি জাতুপপদ্যতে ॥” (১৫।৮) যদি স্বভাবত অস্তিত্ব হয় তবে তাহার নাস্তিত্ব কখনও হইতে পারে না । ইহা সাংখ্যের সম্যক্ অনুমত । কিন্তু পরে যে বলিয়াছেন “প্রকৃতির অন্তথাভাব কখনও উপপন্ন হয় না” তাহা সদোষ কথা কারণ অন্তথাভাব নাস্তিত্ব নহে উহার অর্থ অন্তরূপ ভাব বা অস্তিত্ব । সাংখ্যেরা বলেন এই অন্তথাভাবই অন্যতম মূল স্বভাব তাহার কখনও নাস্তিত্ব হয় না । বৌদ্ধেরা যে ‘অনিত্যং’ চিন্তা করেন এবং উহাকে সত্যচিন্তা বলেন তাহা এই ক্রিয়াশীলতা বা অন্যথাভাবরূপ স্বভাব ।

অতঃপর নাগার্জুন ও তাঁহার অন্যতম বৃত্তিকার চন্দ্রকীর্তির আশ্র্য-সম্বন্ধে আপত্তি পরীক্ষিত হইতেছে ।

“আশ্র্য স্কন্ধা যদি ভবেদুদয়ব্যয়ভাগ্ ভবেৎ । স্কন্ধেভ্যোহন্যো যদি ভবেদ্ ভবেদস্কন্ধলক্ষণাঃ ॥ (মধ্যমকসূত্র ১৮।১) অর্থাৎ আশ্র্য যদি বিজ্ঞানাদি স্কন্ধের অন্তর্গত হয় তবে তাহা উদয়ব্যয়-ধর্মক হইবে আর স্কন্ধ হইতে অন্য কিছু হইলে অস্কন্ধলক্ষণ হইবে । অস্কন্ধ অবিদ্যমান (বৌদ্ধেরা বলেন যাহারা

পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত বস্তু স্বীকার করে তারা বৌদ্ধই নহে) অতএব আত্মা “থপ্পুস্পবন্ নির্কাণবদ্ বা নৈবাত্মব্যাপদেশং প্রতিলভতে” অর্থাৎ তাহা আকাশকুম্বের মত বা নির্কাণের মত এবং তাহা আত্মব্যাপদেশ লাভ করিবে না বা আত্মপদের অর্থের দ্বারা বিশেষিত হইতে পারিবে না ।

এই যুক্তির দোষ এইরূপ—যদি পঞ্চ স্কন্ধ ছাড়া আর কিছু না থাকিত তবে এই কথার মূল্য থাকিত কিন্তু আত্মা বিজ্ঞানাদি স্কন্ধের অতিরিক্ত ও বিজ্ঞানের কারণভূত সৎপদার্থ । নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আত্মা পড়ে না বলিয়া তাহা নাই এরূপ কথা সঙ্গত নহে । বিজ্ঞানকে বিশ্লেষ করিয়া ত্রিগুণরূপ বিকারি কারণ ও পুরুষরূপ অবিকারী হেতু যে সাংখ্য দেখান তাহার দোষ দেখাইতে পারিলে তবেই এ বিষয়ে গ্ৰায় সঙ্গত কথা বলা হইবে । পুরুষে আত্মব্যাপদেশ হওয়া বিধেয় নহে ইহা কতক সত্য কথা । সাংখ্যেরাও বুদ্ধি ও অহংকাররূপ সাধারণ আত্মার ব্যাপদেশ পুরুষে করেন না, কিন্তু তাঁহাতে সাধারণ আত্মাভাবহীনত্বের ব্যাপদেশ করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত আত্মা বলেন ।

চন্দ্রকীর্ত্তি বলেন “সত্যং ক্রবন্তি তীর্থিকাঃ স্কন্ধব্যতিরিক্তশ্চ লক্ষণং ন পুনস্তে স্বরূপত আত্মানমুপলভ্য তশ্চ লক্ষণমাচক্ষতে” অর্থাৎ তীর্থিকেরা (অশ্রুশাস্ত্রকারেরা) আত্মা স্কন্ধব্যতিরিক্ত এরূপ যে লক্ষণ (নিত্যরূপ, অকর্ত্তা, ভোক্তা, নিগুণ, নিষ্ক্রিয়—“আত্মা তীর্থ্যঃ কল্প্যন্তে নিত্যরূপোহ-কর্ত্তা ভোক্তা নিগুণো নিষ্ক্রিয়শ্চ”) করেন তাহা সত্য ; কিন্তু তাঁহারা আত্মাকে স্বরূপত উপলব্ধি করিয়া তাঁহার লক্ষণ বলেন না (অতএব তাঁহাদের কথা সংবৃতি সত্যও নহে অর্থাৎ ব্যবহার সত্যও নহে) ।

আত্মা অবশ্য স্বরূপত উপলব্ধি করার পদার্থ নহে কারণ তিনি অবাঙ্মনসগোচর । কিন্তু তাদৃশ পদার্থ যে আছে ইহা সত্য ও চিন্ত্য বিষয় । সাংখ্যেরা তাহাই বলেন । বৌদ্ধদের নির্কাণও স্বরূপত অনুপলভ্য তথাপি যেমন তাঁহারা নির্কাণের লক্ষণ করেন, আত্মবাদীরাও

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্র্যবাদ) (৫১)

সেইরূপ করেন। সমস্ত শাস্ত্রই সংরুতি সত্য। সংকারণবাদ সংরুতি সত্যের চরম সত্য। অসংকারণবাদ সংরুতি মিথ্যা। সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যবাদ (যাহা মধ্যমক বৌদ্ধ ও আর্ষমার্যাবাদীদের মত) অদার্শনিক প্রলাপ-মাত্র তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে।

বৌদ্ধেরা বলেন “অহংকারোত্ত্বাঃ স্কন্ধাঃসোহহংকারো হনৃতোহর্থতঃ। বীজং বশ্তানৃতং তস্য প্রয়োহঃ সত্যতঃ কুতঃ ॥” (রত্নাবলী) অর্থাৎ স্কন্ধ সকল অহংকারজনিত ; আর সেই অহংকার পরমার্থত অনৃত। যাহার বীজ অনৃত তাহার প্রয়োহ কিরূপে সত্য হইবে ? বিজ্ঞানাদি যে অহং-কারোত্ত্ব তাহা সাংখ্যসম্মত (অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাগ্যভয়মিন্দ্রিয়ং। সাংখ্যসূত্র)। অহংকার বা অস্মিতা যে মিথ্যাজ্ঞান-বিশেষ তাহাও সাংখ্য-সম্মত। তবে মিথ্যা অর্থে অসৎ নহে কিন্তু এককে অন্তরূপ জ্ঞান। অহংকাররূপ মিথ্যাজ্ঞান কাহাকে কি জ্ঞান ? বলিতে হইবে ‘স্কন্ধকে আশ্র্যজ্ঞান’ অতএব সত্য স্কন্ধও আছে আর সত্য আশ্র্যও আছে। নাগার্জুন বলেন যে (মধ্য ১৮।২) সর্ববাদীরা “নির্মমো নিরহংকার অবস্থাকে নির্বাণ বলেন। তাহাতে সিদ্ধ হয়—নির্মমো নিরহংকারঃ শমাদাত্মানীনয়োঃ” অর্থাৎ আশ্র্য বা অহংকার এবং আশ্র্যনীনত্ব বা নমকার নিরুদ্ধ হইলে নির্বাণ সিদ্ধ হয়। প্রশ্ন হইবে তাহা হইলে অবশ্য কিছু নির্মম নিরহংকার পদার্থ থাকিবে (যাহা সাংখ্যদের আশ্র্য)। বৌদ্ধেরা ইহার উত্তর দিতে পারেন না কেবল স্বশাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলেন “ন বিদ্বতে সোহপি কশ্চিদ যো ভাবয়তি শূন্যতাং”। “নির্মমো নিরহংকারো যশ্চ সোহপি ন বিদ্বতে”। গাথায় আছে “স্কন্ধ সত্ভাবতু শূন্য বিবিক্ত বোধি সত্ভাবতু শূন্য বিবিক্ত। যো পি চরেৎ স পি শূন্যসত্ভাবো জ্ঞানবতো ন তু বাল-জনশ্চ”। অর্থাৎ স্কন্ধসকল স্বভাবত শূন্য ও বিবিক্ত, বোধিজ্ঞান স্বভাবত শূন্য বিবিক্ত, যিনি নির্বাণ সাধন করিতেছেন তিনিও শূন্যস্বভাব ও বিবিক্ত ইহা জ্ঞানবান্দের দৃষ্টি বালজনের নহে। বলা বাহুল্য ইহা সব প্রমাণহীন

প্রতিজ্ঞামাত্র। আমি অভিমান ছাড়িতে থাকিলে শেষে অভিমানশূন্য 'আমি' থাকিব ইহাই সাংখ্যীয় গ্রন্থা দর্শন। আমিহের কিছুই থাকিবে না ইহা অকল্পনীয় অন্ত্যায় দৃষ্টি। অভিমানহীন পদার্থকে আত্মা বলিব না বৌদ্ধদের ইহা অভিপ্রায়। তাহাকে তাঁহারা শূন্য বলিতে চান। তাহাতে শূন্য অভিমানশূন্য আমিত্ব হয়। বৌদ্ধেরা বলিবেন অভিমানশূন্য আমিত্ব অর্থে আমিত্বশূন্য আমিত্ব, তাহার অর্থে শূন্য। যদি আমিত্ব অমূল হইত তবে ইহা সত্য হইত। কিন্তু আমিত্ব সকারণভাব। তন্মধ্যে দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব দেখিয়া জানা যায় যে তাহার দুই কারণ—এক দ্রষ্টা বা চেতন আর এক দৃশ্য অচেতন ত্রিগুণ। অভিমান যাইলে মূল-কারণদ্বয়ের কার্য্যই যাইবে কিন্তু সেই কারণদ্বয় থাকিবে। ঐ চেতন বা চৈতন্যরূপ কারণকে আর্ষেরা আত্মা বলেন। সাধারণ ভ্রান্ত আমিত্বকে অগ্নিতা বা অতথ জ্ঞানবিশেষ বলেন।

বৌদ্ধেরা বলেন বিজ্ঞাতা কেহ নাই বিজ্ঞানই আছে। অহংবোধ আলয় বিজ্ঞান “তৎশ্রাদালয়বিজ্ঞানং যদ্ববেদহমাম্পদং”। তাহাই বিজ্ঞাতা আর তদতিরিক্ত বিজ্ঞাতা নাই। কিন্তু ইহা সদোষ কথা। আমাদের স্বত অনুভব হয় “আমি জ্ঞাতা এবং অন্য সব জ্ঞেয়”। এই ‘অন্য সব’ বিশ্লেষ করিলে আন্তর ও বাহ্য পদার্থ অনাত্ম্যভাব হয়। অনাত্ম্যবিজ্ঞেয়ভাব বিজ্ঞাতার সহিত একবৎ প্রতীত হয় ইহাও অনুভব হয়। এই প্রতিভাসের বা মিথ্যাজ্ঞানের হেতু কি? মিথ্যাজ্ঞান একে অন্য জ্ঞান। অতএব বিজ্ঞাতাকে বিজ্ঞেয় জ্ঞান ও বিজ্ঞেয়কে বিজ্ঞাতাজ্ঞান এইরূপ মিথ্যা জ্ঞানে পৃথক্ বিজ্ঞাতা ও পৃথক্ বিজ্ঞেয় থাকিবে যাহাদের প্রতিভাস হয়। জ্ঞাতা ও বিজ্ঞেয় বিরুদ্ধধর্মযুক্ত বলিয়া প্রত্যক্ষত অনুভূত হয়। অতএব বিজ্ঞেয়-ধর্মশূন্য বা দৃশ্যধর্মশূন্য বিজ্ঞাতা আছেন এই সত্য চরম সত্য অর্থাৎ যতদিন মানসচিন্তা থাকিবে ততদিন ইহা সত্য বলিয়া চিন্তিত ও ভাষিত হইবে।

অতঃপর প্রকৃতি সম্বন্ধে বৌদ্ধদের আপত্তি পরীক্ষিত হইতেছে মন্ত, রজ

২। ভূমিকা (নৈরাত্ম্যবাদ ও আত্মবাদ) (৫৩)

ও তম এই তিন গুণের বা দ্রব্যের স্বরূপ বৌদ্ধাদি অনেক ভিন্নবাদীরা মোটেই বুঝেন না। এমন কি অনেক সাংখ্যের ব্যাখ্যাকারেরাও বুঝেন নাই। তাঁহারা গুণত্রয়ের প্রকৃত স্বভাব না বুঝিয়া গুণবৃত্তির লক্ষণ লইয়া গোল করেন। সুখ, দুঃখ ও মোহ ইহাদের নাম গুণবৃত্তি বা গুণপ্রধানবৃত্তি। সত্ত্বপ্রধান চিত্তবৃত্তি সুখ, রজঃপ্রধানবৃত্তি দুঃখ ও তমঃপ্রধানবৃত্তি মোহ। কিন্তু সত্ত্বের স্বভাব প্রকাশ বা জ্ঞাত হওয়া, রজঃ স্বভাব ক্রিয়া বা অবস্থান্তরতা, তমর স্বভাব স্থিতি বা প্রকাশ ও ক্রিয়ার আবরণ, এই তিন স্বভাব বাহ্যান্তর সমস্ত দ্রব্যে পাওয়া যায় বলিয়া সমস্তই ত্রিগুণাত্মক ইহাই সাংখ্যমত। ইহা ছাড়া অন্য মৌলিক স্বভাব নাই। যদি কেহ তাহা দেখাতে পারেন তবেই সাংখ্যমত নিরস্ত হইবে। কিন্তু বৌদ্ধ বা কেহ তাহা দেখাতে পারেন নাই, পারার উপায়ও নাই।

আত্মা-শরীর-আদিকে শূন্য প্রমাণ করার জন্য বৌদ্ধদের একটি সাধারণ যুক্তিপ্রণালী এই :—হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মাংস অস্থি আদি যে ধাতুসকল ইহাদের প্রত্যেকে শরীর নহে। যদি বল উহাদের সমষ্টি শরীর তবে উহা নাম মাত্র হইল। যদি বল শরীর কিছু না হউক কিন্তু অস্থি আদি ত কিছু। তাহাতে বক্তব্য অস্থি আদিও কিছু নহে, কারণ তাহারা পরমাণুর সমষ্টি। আর পরমাণু নিরংশ সূত্রাং শরীর শূন্য। এই যুক্তির এই পর্য্যন্ত সত্য যে পরমাণুর সংস্থান বিশেষই শরীর। কিন্তু পরমাণু নিরংশ বলিয়া কিছু নহে ইহা সত্য নহে। পরমাণু নিরংশ কিছু। সাংখ্য তাহাই বলেন। নিরংশ বা দিগ্ব্যাপ্তিহীন যে অন্তঃকরণ তাহাই মূলত পরমাণু। “অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি” এই সাংখ্যীয় দৃষ্টিই এ বিষয়ে সার কথা। শরীর পরমাণু সমষ্টি, পরমাণু অভিমান-মূলক, অভিমান মহান্ আত্মা বা আমি মাত্র বোধমূলক, তাহারও উপাদান দৃশ্য ত্রিগুণ ও হেতু দ্রষ্টৃ চৈতন্য—এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত সংপদার্থ স্বীকার দার্শনিক দৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত হয়।

বৌদ্ধাদিরা প্রকাশাদি স্বভাব ছাড়িয়া ‘প্রসাদ তাপ দৈন্য’ বা ‘প্রসাদ উদ্বিগ্ন আবরণ’ প্রভৃতি সুখদুঃখমোহ বাচক কথা বুঝিয়া তাহার দ্বারা বাহ্য-স্তর পদার্থ নির্মিত—এরূপই সাধ্যমত মনে করিয়া বিচার করেন। সূত্রাং তাহা সব অলক্ষ্যগামী বিচার। তাদৃশ বাজে কথা পরীক্ষা করা নিষ্ফল। সুখ দুঃখ ও মোহের দ্বারা বাহ্যস্তর পদার্থ নির্মিত নহে কিন্তু প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির দ্বারা নির্মিত।

শান্তুরক্ষিত বলেন “সিদ্ধেহপি ত্রিগুণে ব্যক্তে ন প্রধানং প্রসিধ্যতি। একং তৎকারণং নিত্যং নৈকজাত্যনিত্যং হি তৎ ॥” (তত্ত্বসং ৪১) ব্যক্তভাব সকল ত্রিগুণাত্মক ইহা সিদ্ধ হইলেও প্রধান সিদ্ধ হয় না, কারণ ব্যক্তভাবের কারণ প্রধান এক ও নিত্য, আর ব্যক্তভাব সকল বহু ও অনিত্য অতএব তাহার এক জাতীয় নহে (অর্থাৎ এক জাতীয় নহে বলিয়া ব্যক্তের ও অব্যক্তের কার্য-কারণ ভাব নাই যেহেতু কার্যে ও কারণে এক জাতীয় হওয়া আবশ্যিক)। সাংখ্যা বলেন কার্যে ও কারণে সম্যক অভেদ থাকে না কিন্তু মূল স্বভাবে অভেদ থাকে আর নিমিত্তের দ্বারা কারণ হইতে কিছু ভেদ হইয়া কার্য হয়। যেমন মৃৎপিণ্ড কারণ ও ঘট কার্য। মৃত্তিকাত্ব স্বভাবে উহার একজাতীয় কিন্তু আকারে ভিন্ন জাতীয়। ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়। ব্যক্ত ও অব্যক্তে সেইরূপ প্রকাশক্রিয়াম্বিত স্বভাবে একতা; আর নিত্যত্ব, অব্যাপিত্ব, একত্ব-আদি এবং অনিত্যত্ব, অব্যাপিত্ব, বহুত্ব-আদি স্বভাবে অনৈক্য। অতএব বৌদ্ধের আপত্তি নিঃসার। “অয়ঃশলা-কাকল্লা হি ক্রমসঙ্গতমূর্ত্তয়ঃ। দৃশ্যন্তে ব্যক্তয়ঃ সৰ্ব্বাঃ কল্পনা মিশ্রিতাশ্চিকাঃ ॥” (তত্ত্ব সং ৪২) পূর্বে যে ব্যক্তভাবের বহুত্ব ও অনিত্যত্ব বলিয়াছেন তাহা শান্তুরক্ষিত দেখাইতেছেন—ব্যক্তভাব সকল লৌহশলাকার মত পরস্পর বিভিন্ন বা বহু, কালক্রমে উঠিতেছে ও যাইতেছে বলিয়া অনিত্য (ক্রম-সঙ্গত-মূর্ত্তি) আর তাহার কল্পনার দ্বারা এক বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে বহুত্ব ও অনিত্যত্ব-হেতু ব্যক্ত দ্রব্য সকল এক নিত্য প্রধান হইতে ভিন্ন-

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্রয়বাদ) (৫৫)

জাতীয় সূত্রাং ব্যক্ত সকল প্রধানের কার্য হইতে পারে না। ইহার উত্তর উপরে দেওয়া হইয়াছে। তবে এখানে ক্ষণভঙ্গরূপ যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মত উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পরীক্ষণীয়।

তন্মতে “যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা ঘটঃ” (ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিতে রত্নকীর্তি)। সংক্ষেপত এইমত এইরূপ, যেমন প্রদীপে প্রতিমূহূর্তে নূতন তৈল আসিয়া নূতন আলোক করে প্রতিক্ষণের তৈল ও আলোক যেমন বিভিন্ন হইলেও এক বলিয়া প্রতিভাত হয় সেইরূপ এই বাহ ও আধ্যাত্মিক জগৎ ক্ষণমাত্র-স্থায়ি, প্রতিক্ষণে নূতন জগৎ বা ধর্মক্ষক উদয় হইতেছে ও বিনাশ হইতেছে। পূর্বক্ষণের ধর্ম ও উত্তর ক্ষণের ধর্ম এই দুইয়ে কোন মৌলিক ভাব পদার্থ অন্বিত থাকে না; উভয়ই পৃথক্। তবে এইমাত্র বক্তব্য যে পূর্বটি প্রত্যয় বা কারণ ও পরটি প্রতীত্য বা কার্য। প্রত্যয় না থাকিলে প্রতীত্য থাকে না এতাবন্মাত্রই বক্তব্য। কারণ কার্যরূপে পরিণত হয় বা কার্যে যায় ইহা বক্তব্য নহে। কারণ এবং কার্য নিরনয় অর্থাৎ ঐ দুইয়ের মধ্যে কিছু সাধারণ অন্বিত ভাব নাই। ইহা অনেক বৌদ্ধের মত। ইহার নাম ক্ষণ-ভঙ্গবাদ। শান্তুরক্ষিত, রত্নকীর্তি প্রভৃতির ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি প্রকরণে এই মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তন্মতে স্থিরভাব কিছু নাই। সাংখ্যীয় দর্শনেও জগৎ ক্রিয়াশীল বা পরিণামশীল সূত্রাং ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হইতেছে ও ব্যক্ত ভাব সকল অস্থির। কিন্তু পূর্ব ধর্মো ও পরধর্মো বা কারণে ও কার্যে সমন্বয় (সমন্বয়াৎ—সাংখ্যকারিকা) আছে অর্থাৎ কিছু ভাব পদার্থ কারণ হইতে কার্যে আসে। সমন্বয় ও নিরনয় এই দুই দৃষ্টিতেই সাংখ্যে ও বৌদ্ধে (সব বৌদ্ধে নহে) এস্থলে ভেদ। যদি বৌদ্ধকে বলা যায় যে পিণ্ডে ও ঘটে এক মৃদক্ষ্ম অন্বিত থাকে দেখা যায়, তবে এই সহজ প্রজ্ঞার দৃষ্টিকে বৌদ্ধ এইরূপে খণ্ডিত করার চেষ্টা করেন, যথা—“মৃদ্ধিকারাদয়ো ভেদা নৈকজাত্যান্বিতা স্তথা। সিদ্ধা নৈকনিমিত্তাশ্চ মৃৎপিণ্ডাদেবি ভেদতঃ” (তত্ত্ব সং ৪৩) অর্থাৎ মৃৎসুবর্ণ আদির বিকারে সেই বিকৃতভাব সকল একজাত্যান্বিত নহে আর

তাহারা এক নিমিত্তকণ্ড (নিমিত্ত অর্থে কারণ মাত্র) নহে । কারণ, মৃত্তিকা স্তূর্ণাদি অবয়বী দ্রব্য, তাহাদের এক এক অবয়ব হইতে বা এক এক মৃৎপিণ্ড স্তূর্ণ পিণ্ড আদি হইতে এক এক ঘট কুণ্ডল আদি উৎপন্ন হয় । ভাবার্থ এই যে “মাটীই ঘট হয়” এই কথা ঠিক নহে কারণ সব মাটী সব ঘটে থাকে না । বলা বাহুল্য ইহা অতি স্থূলগোছের ত্রায়ের ফক্কিকা মাত্র । কারণের কতক ধর্ম যে কার্যে একরূপ থাকে বা অন্বিত থাকে এই সাংখ্যীয় দৃষ্টি, ইহার দ্বারা খণ্ডিত হয় না * । স্তূর্ণপিণ্ডে ও স্তূর্ণ বলয়ে যে ভারবত্তা সৌবর্ণ্য প্রভৃতি এক থাকে কেবল আকারধর্মের ভেদ হয় এই সহজ প্রজ্ঞার সাংখ্যীয় (বৈজ্ঞানিক আদিরও) দৃষ্টি বৌদ্ধেরা ঐরূপ ত্রায়ের ফাঁকির দ্বারা খণ্ডিত করার চেষ্টা করিয়াছেন । সাংখ্যেরা (আধুনিক বৈজ্ঞানিক আদিরাও সকলে) বলেন জগৎ ক্রিয়ামূল স্তূর্ণাং ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হইতেছে । অতএব এবিষয়ে মাধ্যমিকাদি বৌদ্ধেরা প্রাচীন সাংখ্যের কথাই বলেন । সাংখ্য আরও বলেন কারণ রূপ কতকগুলি ধর্ম কার্যে এক থাকে । কতক ধর্ম যে নূতন উৎপন্ন বা ব্যক্ত হয় তাহাই কার্যত্ব । মৌলিক ধর্ম যাহারা এক থাকে তাহারা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি । বৌদ্ধেরা বলেন তাহা শূন্য । সাংখ্যেরা বলেন তাহা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির সাম্য বা অব্যক্ত অবস্থা । কিন্তু সাংখ্যেরা বলেন ভাব হইতে ভাব হয় এবং ভাব ভাবেই লীন হয় । বৌদ্ধ বলেন “শূন্যেভ্য এব শূন্য ধর্ম্যঃ প্রভবন্তি ধর্ম্মেভ্যঃ” “নহি উৎপত্তমানঃ সংস্করূপেণ কুতশ্চিদাগচ্ছতি, নিরুধ্যমানো বা কুতশ্চিৎ সন্নিচয়ং গচ্ছতি” (প্রজ্ঞাকরমতি) অর্থাৎ শূন্য ধর্ম্মসকল হইতে শূন্যধর্ম্ম সকলই উৎপন্ন হয় । সক্রমে উৎপত্তমান

* বৌদ্ধদের ভদন্ত ধর্ম্মত্রাতের মতে—“যথা স্তূর্ণ দ্রব্যস্ত কটককেয়ুর কুণ্ডলাদ্যভিধান নিমিত্তস্ত গুণস্তাত্ত্বাৎ ন স্তূর্ণস্ত ।” ইহা ঠিক সাংখ্যীয় ও সহজ প্রজ্ঞার দৃষ্টি । মধ্যমকেরা ইহা উক্ত* প্রকারে উড়াইয়া দিতে চাহেন ।

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্রয়বাদ) (৫৭)

কোন বস্তু কোথা হইতে আসে না। এবং নিরুদ্ধ্যমান বা নাশ হইলে কোথাও সন্নিহিত হইয়া থাকে না *। এই সব কথাই অর্থ যে কিরূপ অসঙ্গত তাহা অধিক না বলিলেও বুঝা যাইবে। কারণের কিছু পরিবর্তন

* মধ্যমকদের এইরূপ অসঙ্গত মত হইলেও প্রাচীন সর্বাশ্রয়বাদী বৌদ্ধদের এরূপ মত ছিল না। ভদন্ত ধর্মত্রাত (ইনি সংস্কৃত ধর্মপদের সংগৃহীতা) ও ভদন্ত বসুমিত্র (ইঁহার কনিষ্ঠের সমসাময়িক) ঠিক সাংখ্যমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাংখ্যমতে ধর্মসকল ত্রিকালস্থায়ী। অধ্বভেদ বা কল্পিত কালভেদ করিয়া আমরা মনে করি ও বলি যে উহা অতীত ও উহা বর্তমান ও উহা অনাগত। যোগভাষ্যকার বলেন “তত্র ধর্মশ্চ ধর্মিণি বর্তমানশ্চ এব অধ্বশ্চ অতীতানাগতবর্তমানেষু ভাবান্তথাৎ ভবতি ন দ্রব্যান্তথাৎ।” “যথা পুরুষ একস্যাং স্ত্রিয়াং রক্তো ন শেষাস্থ বিরক্তো ভবতীতি।” ভদন্ত ধর্মত্রাতের মতে “ধর্মস্যাদ্বশ্চ বর্তমানস্য ভাবান্তথামেব কেবলং ন দ্রব্যান্তথাৎ”। ভদন্তঘোষক দৃষ্টান্ত দেন “যথা পুরুষ একস্যাং স্ত্রিয়াং রক্তো ন শেষাস্থ বিরক্তঃ” ইত্যাদি। যোগভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দেন “যথৈকা রেখা শতস্থানে শতং দশস্থানে দশ একা চৈকাস্থানে”। ভদন্ত বসুমিত্র এ বিষয়ে বলেন “যথা মৃদুগুড়িকা একাদ্ধে প্রক্ষিপ্তা একমুচ্যতে শতাদ্ধে শতং সহস্রাদ্ধে সহস্রং”। যোগভাষ্যকারের শ্রী বুদ্ধদেব নামক বৌদ্ধ গ্রন্থকার বলেন “যথৈকা স্ত্রী মাতা চোচ্যতে দুহিতা চেতি”। এই প্রাচীন বৌদ্ধ লেখকেরা সাংখ্যেরই মত লইয়াছিলেন। পরবর্তী মধ্যমকেরা উহা খণ্ডন করিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন যে উহা সাংখ্যমত। সাংখ্যের শ্রী উক্ত ভদন্ত সকলের মতে ধর্মসকল ত্র্যধ্বা। ত্রিকালই তিন অধ্বা। ধর্মসকল বর্তমান হইলেও যখন অর্থক্রিয়াকারী বা অনুভূয়মান (বৌদ্ধভাষায় কারিত্রয়ুক্ত) হয় তখন বর্তমান বলি, অনুভূতকে অতীত বলি আর অনুভবিষয়মাণকে অনাগত বলি।

হইয়া কার্য হয় এবং “নাশঃ কারণলয়ঃ” এই তথ্য প্রসিদ্ধ এবং নিতান্ত বিকৃত দৃষ্টি না হইলে কেহ ইহার প্রতিষেধে সাহসী হয় না। কার্য হইতে কারণে যাইতে যাইতে সাংখ্য মূল কারণ ত্রিগুণে যান। মূল কারণের আর কারণ না পাওয়াতে তাহাকে নিত্য বলেন ; যেমন ক্রিয়াস্বভাব রজঃ ; ইহার কারণ কি তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। বলিতে হইবে “ক্রিয়া হইতে ক্রিয়া হয়” বা ক্রিয়া বা পরিবর্তন হওয়া বরাবরই আছে। প্রকাশ বা জ্ঞেয়ের জ্ঞাত হওয়া স্বভাবও বরাবর আছে স্থিতিও সেইরূপ। স্বভাব মানে কি তাহাও জানা কর্তব্য। বৌদ্ধ বলেন “যো হি বস্য স্বভাবঃ সকথং কদাচিদপি নিবর্ত্তেত” (প্রজ্ঞাকরমতি) অর্থাৎ যাহা কখন নষ্ট হয় না এরূপ ধর্মই স্বভাব। সাংখ্যমতে “অনুৎপন্নঃ সহোৎপন্নো বা সহভাবী বা ধর্মরূপো ভাব এব স্বভাবঃ” অর্থাৎ যে গুণ কোন ভাবের উৎপাদের সহিত উৎপন্ন এবং নাশে নাশ হয় অথবা যে ধর্ম অনুৎপন্ন বা বরাবর আছে ও থাকিবে তাহাই স্বভাব নামক ধর্ম বা জ্ঞাতগুণ। এ বিষয়ে উভয় দৃষ্টি প্রায় একরূপ। যেমন শরীরের বাহ্য স্বভাব বলিবে তাহা শরীরের সহিত উৎপন্ন ও যাবৎ শরীর স্থায়ী ধর্ম। শুদ্ধ ক্রিয়াস্বভাব (রজ) অনুৎপন্ন স্বভাব। অনুৎপন্ন সূত্রাৎ নাশ হয় না বলিয়া নিত্য। (বৌদ্ধমতে “নিত্যং তমাহ বিদ্বাংসো যঃ স্বভাবো ন নশ্ৰতি” সূত্রাৎ তন্মতে আগমাপায়ী ভাব নিঃস্বভাব) † এইজন্য ত্রিগুণ নিত্য। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি কবে ছিল না ও থাকিবে না তাহা কেহ দেখাইতে পারিলে তবেই নিত্য ত্রিগুণ দৃষ্টি খণ্ডিত হইবে, নচেৎ নহে।

বৌদ্ধদের যুক্তি—যদি ‘আছে’ কিন্তু ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা ‘নাই’ হয়। ‘আছে’ ও ‘নাই’ বিরুদ্ধ স্বভাব। বিরুদ্ধ স্বভাব এক বস্তুতে থাকিতে পারে না অতএব ঘট শূন্য। এই গ্ৰন্থ এত অসার যে তদ্বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। ‘আছে’ ও ‘নাই’ ইহা কথা মাত্র। ইহার স্বভাব বা প্রকৃত ধর্ম নহে। প্রধান সম্বন্ধে বৌদ্ধ এক বিরুদ্ধ যুক্তি দেন যে এক বস্তুর তিন

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্রয়বাদ) (৫৩)

স্বভাব হইতে পারে না, প্রধানের তিন স্বভাব অতএব প্রধান নাই। এক বস্তুর তিন (একাধিক) স্বভাব কেন হইতে পারে না তাহা বৌদ্ধ বলেন না। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও স্থৌল্য এই তিন স্বভাব ত সকল বাহ্য বস্তুর আছে। তাঁহাদের আর এক যুক্তি—যখন গুণ তিন তখন প্রধান এক হইবে কেন? আপনারা প্রধানকে এক বলেন অতএব প্রধান নাই। অবিনাভাবী তিন গুণকে সাংখ্য প্রধান (শ্রেষ্ঠ কারণ), প্রকৃতি (উপাদান কারণ) বলেন আবার ত্রৈগুণ্যও বলেন স্মৃতরাং ইহা নাম লইয়া ঝগড়া। ত্র্যঙ্গ দ্রব্যকে প্রধান বলা হয় আর সেই অঙ্গ সকল অবিনাভাবী ও কদাপি বিযোজ্য নহে তাই এক বলার বিশেষ হেতু আছে। প্রকাশ স্থিতি ছাড়া ক্রিয়া, ক্রিয়া ছাড়া প্রকাশ স্থিতি, স্থিতি ছাড়া প্রকাশ ক্রিয়া যদি দেখাইতে পার তবেই তিন বলার সার্থকতা হইতে পারে। ফলে ত্রিগুণই প্রকৃতি ইহা সাংখ্যমত, তাহার তিন অঙ্গ দেখিয়া তিন বল বা যা বল তাহাতে সাংখ্যের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। একজন বলিল “ওখানে মনুষ্য আছে” আর একজন তাহাতে বলিল “মনুষ্য এক এক জন হয়, ওখানে তিনজন আছে; অতএব ওখানে মনুষ্য নাই”। বৌদ্ধদের গ্ৰায়াভাসও এইরূপ। অথবা একজন বলিল “এই দ্রব্যের পরিমাণ আছে” তাহাতে অগ্রে দোষ ধরিল যে লম্বা, চওড়া ও মোটা আছে, পরিমাণ নাই। অবিনাভাবী লম্বা, চওড়া ও মোটার নাম যেমন পরিমাণ সেইরূপ অবিনাভাবী প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির নাম প্রকৃতি বা উপাদান কারণ। এইসব বিষয় অগ্রে বোধিচর্য্যাবতারের বঙ্গানুবাদে সর্বিশেষ দেখান হইয়াছে বলিয়া এখানে অধিক বলা হইল না।

শূন্যতা প্রমাণের (বৌদ্ধদের) আর এক যুক্তি এইরূপ :—নাগার্জুন বলেন (মাধ্যমিকার ৫ম প্রকরণে) “নাকাশং বিঘ্নতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বমাকাশ লক্ষণাৎ । অলক্ষণং প্রসজ্যেত স্যাৎ পূর্ব্বং যদি লক্ষণাৎ ॥ অলক্ষণো ন কশ্চিচ্চ ভাবঃ সংবিঘ্নতে কচিৎ । অসত্যলক্ষণে ভাবে ক্রমতাং কুহলক্ষণম্ ॥ না লক্ষণে লক্ষণস্য প্রবৃতি ন সলক্ষণে । সলক্ষণালক্ষণাত্যাং নাপ গুত্র

প্রবর্ততে । লক্ষ্যাসম্প্রবর্ত্তোচ ন লক্ষ্যমুপপত্ততে । লক্ষ্যস্যানুপপত্তোচ লক্ষ-
 গন্যাপ্যাসম্ভবঃ । তস্মান্ন বিদ্যতে লক্ষ্যং লক্ষণং নৈব বিদ্যতে । লক্ষ্যলক্ষণ-
 নিশ্চুক্তো নৈব ভাবোহপি বিদ্যতে ॥ অবিদ্যमाने भावे तु कस्याभावो
 भविष्यति । भावाभावविधर्माच्च भावाभावमवैति कः ॥” অর্থাৎ আকাশধাতু
 কিছু নাই । কারণ আকাশের লক্ষণ যে অনাবরণ তাহা আকাশের পূর্বে
 থাকে না । অতএব পূর্বে আকাশ অলক্ষণ থাকে । কিন্তু লক্ষণশূন্য
 কিছু বা ভাব পদার্থ কোথাও নাই । তাহা না থাকিলে লক্ষণ কিসে আক্রান্ত
 হইবে না লক্ষিত করিবে ? কিঞ্চিৎ অলক্ষণে লক্ষণের প্রবর্ত্তি হয় না সলক্ষণেও
 (নিশ্চয়োজনহ হেতু) তাহা হয় না । আর সলক্ষণ অলক্ষণ এই দুই
 ছাড়া অত্রও লক্ষণের প্রবর্ত্তি হওয়া সম্ভব নহে । লক্ষণ প্রবর্ত্তিত না
 হইলে লক্ষ্যও উপপন্ন হয় না । লক্ষ্য সিদ্ধ না হইলে লক্ষণও সিদ্ধ হইবে
 না । অতএব লক্ষ্য ও লক্ষণ দুইই নাই । সুতরাং লক্ষ্য-লক্ষণ না থাকাতে
 ভাবও নাই । আর ভাব নাই বলিয়া অভাবও নাই ; পরঞ্চ ভাবও নাই
 অভাবও নাই বলিয়া ভাবাভাবের পরীক্ষকও নাই ।

এই শেষ বিনিগমনায় সিদ্ধ হইবে যে ভাবাভাবের পরীক্ষক নাগার্জ্জুনও
 নাই বা ছিলেন না (যুক্তিটাই এইরূপ—শুধু ডান পায়ে চলা যায় না ও
 শুধু বাম পায়েও চলা যায় না, অতএব চলাই যায় না—চলা বলিয়া কিছু
 নাই । এই জাতীয় আর এক গ্রামাভাস আছে যথা—যদি কোন দ্রব্য
 হইতে অবকাশ বা space বাহির করিয়া লওয়া যায় তবে সেই দ্রব্য
 থাকে না ; অতএব দ্রব্য = অবকাশ । সেইরূপ কোন দ্রব্য হইতে যদি সত্তা
 বাহির করিয়া লওয়া যায় তবে দ্রব্যের সত্তা বা দ্রব্য থাকে না ; অতএব
 দ্রব্য = সত্তামাত্র ।

প্রথমে যে major premise করা হইয়াছে—‘আকাশের পূর্বে আকাশ
 লক্ষণ থাকে না’ তাহা ভ্রান্তি । ‘শব্দগুণক অনাবরণ লক্ষণক আকাশ’
 এইরূপ মাত্র আকাশের লক্ষণ নহে । সাংখ্যেরা বলেন আকাশ দৃশ্যত্ব-

২। ভূমিকা (নৈরাখ্যবাদ ও আখ্যবাদ) (৬১)

লক্ষণক বা ত্রিগুণলক্ষণক। তাহা আকাশের পূর্বেও থাকে। তাহারই অবস্থান্তরতামাত্র শব্দলক্ষণক আকাশভূত। ত্রিগুণের পূর্ব নাই সুতরাং তাহারা সদাই সলক্ষণ কখনও অলক্ষণ নহে।

ঐরূপে পঞ্চভূত ও বিজ্ঞান এই ছয় ধাতুকে বৌদ্ধেরা শূন্য (মধ্যমকদের ভাষায় “ভাবও নহে অভাবও নহে”) প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান।

সমস্ত আর্ষসম্প্রদায়েরা জগতের স্রষ্টা, পাতা ঈশ্বর স্বীকার করেন। বৌদ্ধেরা পাতা মহাপুরুষ স্বীকার করিলেও স্রষ্টা স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে তাঁহাদের মত সংক্ষেপে পরীক্ষিত হইতেছে। বৌদ্ধেরা ইন্দ্র, বৈশ্রবণ, ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, ঈশ্বর বা শিব, কুমার (কার্ত্তিকেয়) প্রভৃতি স্বীকার করেন। ললিত বিস্তরে আছে বুদ্ধ স্বয়ং নারায়ণ। তদ্যতীত মহাযানেরা আদিবুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর আদি এবং সকলেই সম্বর্ত্ত বা জগতের উদ্ভব এবং বিবর্ত্ত বা লয় স্বীকার করেন। ইন্দ্রাদি দেবতারা গোড়া বৌদ্ধ (সেইরূপ জৈনদের ইন্দ্রাদি গোড়া জৈন, হিন্দুদের ইন্দ্রাদি হিন্দু) এবং তাঁহারা বৌদ্ধদের সহায়তা করেন। যম, যমদূত, নরক, স্বর্গ সব তন্মতে প্রায় হিন্দুদের গ্ৰায়। জগতের কর্ত্তা বা স্রষ্টা তন্মতে স্বীকৃত নহে। ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধেরা যে সব যুক্তি দেন তাহাতে সাধারণ ঈশ্বরবাদ খণ্ডিত হইলেও সর্ববিৎ সর্বকর্ত্তা অথবা অনাদিমুক্ত সাংখ্যযোগের ঈশ্বর খণ্ডিত হয় না। মহাযানদের আদিবুদ্ধ যোগের অনাদিমুক্ত ঈশ্বরের তুল্য। জগৎ কিরূপে হইয়াছে তদ্বিষয়ে বৌদ্ধেরা বলেন “কর্ম্ম হইতে”। কাহার কর্ম্ম হইতে হইয়াছে? এতদ্বিষয়ে দুই মত আছে। হীনযানেরা বলেন মনুষ্যের কর্ম্ম হইতেই চন্দ্রসূর্য্যাদি সৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধিমার্গে আছে প্রাথমিক পার্থিব সত্ত্বগণ অন্ধকারে অসুবিধা ভোগ করাতে আলোকের ‘চন্দ’ (ইচ্ছা) করাতে ‘চন্দ’ (বা চাঁদ) উৎপন্ন হইল। সূর্য্যও সেইরূপে উৎপন্ন হইল। তাহাতে ‘সুরিয়’ বা শৌর্য্য হওয়ায় উহার নাম সুরিয় রাখা হইল। বলা বাহুল্য যে ইহা বালকোচিত মত। মহাযানদের একমত—দেবতাদের

কর্মা হইতে লোক উৎপন্ন হইয়াছে। সাংখ্যাদি আর্ষ শাস্ত্রের প্রকৃত মত হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বা অক্ষর ব্রহ্ম পূর্বসিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহার ঐশসংস্কার-মূলক সঙ্কল্প (প্রকৃতি-বশিত্ব নামক সিদ্ধি) হইতে সৃষ্ট জগতের মূল সত্তা ব্যক্ত হয়, পরে দেব মনুষ্যাদিরা স্বসংস্কারানুসারে সেই মূল সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্ততা লাভ করে। ফলে ঐশ সৃষ্টি ও জৈবসৃষ্টি সমস্তই কর্মজ। স্রষ্টা একজন ব্রহ্মা নিত্য নহেন কিন্তু ব্রহ্মারা নির্বাণমুক্ত হইয়া যান। পরে পরে অন্য ঐরূপ সিদ্ধ স্রষ্টা হন।

বৌদ্ধদেরকেও কার্যত উহাই স্বীকার করিতে হয়। শাস্ত্ররক্ষিত বলেন “বুদ্ধিমৎ পূর্বকত্বং হি সামান্তেন যদীষ্যতে। তত্র নৈব বিবাদো নো বৈশ্বরূপ্যং হি কর্মজম্। নিত্যৈক বুদ্ধিপূর্বকত্বসাধনে সাধ্যশূন্যতা।” (তত্ত্ব সং ৮০।৮১)। অর্থাৎ যদি আপনারা বলেন যে বুদ্ধিপূর্বক (দেব মনুষ্যের বুদ্ধি পূর্বক) সৃষ্টি হয় তবে এই সামান্যবাদে আমাদের বিবাদ নাই, কারণ আমাদের মতেও এইয়ে বৈশ্বরূপ্য তাহা কর্মজ (সূতরাং বুদ্ধিমৎ পূর্বক)। নিত্য একবুদ্ধিপূর্বক জগৎ সৃষ্ট হয় ইহা গ্ৰায়সাধ্য নহে। আর্ষ সম্প্রদায়ের অনেকেই এই মত। একজন নিত্য স্রষ্টা অনেকেই সম্মত নহে।

ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে সাংখ্যীয় বা আর্ষমত। দেবতাদের মধ্যে যিনি মহাদেব তাঁহার কর্মে (কর্ম ইচ্ছামূলক) লোক উদ্ভূত হইলে সাংখ্যমতেই বৌদ্ধকে আসিতে হয়। সাংখ্যমতে পূর্বসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা সর্ববিৎ সর্বকর্তা। বৌদ্ধেরা এবিষয়ে আপত্তি করেন যে তিনি সর্ববিদ হইলে প্রচলিত বৌদ্ধভাষায় (মধ্যমক ভাষায়, বোধ হয়) গোক্ষবিষ্ণুর উপদেশ করিতেন তাহা না করাতে তিনি সর্ববিৎ নহেন। বলা বাহুল্য ইহা দার্শনিক হিসাবে অহংমুখতা। কারণ, সর্ব সম্প্রদায়েই নিজেদের মতকে সত্য বলেন এবং ঈশ্বরকে তাহার অনুমোদক বলেন সূতরাং এরূপ যুক্তির বিশেষত্ব নাই। সমস্তভদ্র, অজিত বা মৈত্রেয় নাথ, মঞ্জুঘোষ, অবলোকি-

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্রয়বাদ) (৬৩)

তেশ্বর এমনকি গৌতমবুদ্ধও, * যাঁহারা উপরে থাকিয়া বৌদ্ধদের পালন করিতেছেন, তাঁহাদের কেহ যদি বৌদ্ধদের অগণ্যমতের সামঞ্জস্য করিয়া সর্বগ্রাহ্য এক সত্যমত স্থির করিয়া দিতেন তবে উক্তমত সার্থক হইত।

ফলতঃ অশ্রাদাদি সর্বমনের উপর কার্যকারি এক মহামন আছে (যাঁহার এই মহামন তিনিই স্রষ্টা পাতা) এই যে উপনিষদ-সাংখ্যাশাস্ত্র-স্থিত মত তাহা লোক সৃষ্টি বিষয়ে সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত বাদ। আর সেই

* হীনযানদের মতে গৌতম বুদ্ধের কিছুই নাই (এক বৌদ্ধ বলিয়া-ছিলেন কেবল তাঁহার অস্থিমাত্র আছে)। মহাযানদের অনেকের মতে বুদ্ধ এখন স্বর্গলোক বিশেষে (সুখাবতীতে) আছেন এবং যতদিন না সর্বপ্রাণী নির্বাণপ্রাপ্ত হয় ততদিন থাকিবেন। কারণ মহাযানমতে অপরকে ফেলিয়া নিজে নির্বাণ লওয়া স্বার্থপরতা। ইহা অবশ্য পরার্থপরতাবাদের বা altruism এর অপব্যবহার। কারণ, নির্বাণে সুখ-ছুঃখ, স্বার্থপরার্থ আদি নাই। স্কন্ধ সকলে মহাবৈরাগ্য করিয়া নিরোধ করিলে যে আদর্শ দেখান হয়, তাহা অপেক্ষা স্কন্ধসকল লইয়া থাকা যে হীন আদর্শ তাহা হীনযানেরা বলিতে পারেন। বিশেষতঃ এই বাদে কোন বুদ্ধই নির্বাণপ্রাপ্ত হন নাই ও হবেন না এইরূপ আসিয়া পড়িবে। কারণ অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সংসৃতি আছে ও থাকিবে সুতরাং বুদ্ধেরা কখনও নির্বাণ পান নাই ও পাইবেন না। এইরূপে এই বাদ অসম্ভব altruism মাত্র বা অসম্ভব পরার্থপরতামাত্র ও কেবল প্রচ্ছন্ন স্কন্ধানুরাগ মাত্র। কথায়ও বলে “সর্বমত্যন্তগর্হিতম্”। সুখাবতীতে (নরকে নারকীরা থাকিলেও) স্বর্গ সুখভোগ করা অপেক্ষা স্কন্ধসকলে মহানির্বেদ করিয়া ত্যাগ করা যে উন্নততর আদর্শ তাহা মহাযানদের ধারণায় আসে নাই। *অনেক রোগী আছে বলিয়া দয়ালু ব্যক্তির রুগ্ন হওয়া উচিত কি ?

ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের প্রণিধান করিলে যে ব্রহ্মবৎ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ হওয়া যায় এই ঋষিমত (ব্রহ্মৈব মনু ব্রহ্মাপ্যোতি) অনবগু দার্শনিক মত । বুদ্ধও 'এই ব্রহ্মাণ্ড আমি বা আমার' বলিয়া গিয়াছেন, তাহা 'এহং ব্রহ্মাস্মি' ছাড়া আর কিছু নহে (বৌদ্ধেরা অণু অর্থ করিলেও) ।

অতঃপর 'ভাব' 'শূন্য' 'ধন্ম' প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের অর্থ বৌদ্ধ ও আর্ষ দৃষ্টিতে বিচার্য, কারণ তাহার উপর উভয় মতের ঐক্য ও অনৈক্য অনেকটা নির্ভর করে ।

ভাব শব্দের অর্থ সং বা যাহা আছে । বৌদ্ধেরা উহার অণু অর্থ করেন যথা, "হেতু প্রত্যয়ং প্রতীত্য ভবন্তি স্বরূপং লভন্ত ইতি ভাবাঃ । ন পুনঃ পারমার্থিকং রূপং নিজমেষামস্তি । ইতি ভাবশব্দেন নিঃ স্বভাব-তাভিধানং প্রতীয়তে" । যাহা কারণ হইতে হয় তাহাই ভাব । এইরূপ লক্ষণে নির্বাণ বা আত্মা অভাব হইবে । অতএব শব্দার্থ লইয়াই গোল । শূন্য ও ঐরূপ ।

কোনও দ্রব্যকে 'অস্তিত্ব বলিব না' 'নাস্তিত্ব বলিব না' মাদ্যমিকদের এই মতের মূল বুদ্ধের তথাকথিত উক্তি যে—আত্মা শাশ্বত ইহা বক্তব্য নহে ও তাহার উচ্ছেদ হয় এরূপও বক্তব্য নহে । ইহা নাগার্জ্জুনের মত । এই শাশ্বত ও উচ্ছেদবাদের মূলে ব্রহ্মজালসূত্র আছে । তথায় আছে যে কোন কোনও বাদীরা শীলবান্ হইয়া সমাধিসিদ্ধ হওত পূর্বজন্মের জ্ঞান-লাভ করিয়া শত শত সহস্র সহস্র পূর্বজন্ম দেখিয়া মনে করেন যে এই আত্মভাব শাশ্বত । আবার কেহ বলেন মৃত্যুর পর আত্মভাব উচ্ছিন্ন হইয়া যায় । এই দুই বাদই ভ্রান্তি, সাংখ্যেরও অবিকল ইহা সম্মত । ইহা স্পষ্টই সাধারণ আত্মভাবের কথা । কিন্তু বৌদ্ধেরা সাধারণ আত্মভাবের যাহা মূল সেই সাংখ্যের প্রকৃত আত্মাকেও এরূপ বলিতে চান, যদি চ ব্রহ্মজালের কথায় উহা আসে না । আর মধ্যমকেরা সর্ব পদার্থ সম্বন্ধেই ঐরূপ বলিতে চান (ব্রহ্মজালের কথাকে মূল করিয়া) । শাশ্বত শব্দের

২। ভূমিকা (নৈরাহ্যবাদ ও আত্মবাদ) (৬৫)

অর্থ করেন ‘অস্তি’, এবং ‘উচ্ছেদ’ অর্থে করেন ‘নাস্তি’ তাহা করিয়া কোন দ্রব্যকে ‘অস্তি’ বা ‘নাস্তি’ না বলাই “তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদ্বঃ” ।

বৌদ্ধদের ধর্মশব্দের অর্থও বুঝা উচিত । ধর্ম অর্থে যাহা ধারণ করে । তাহাতে যাহা স্বভাব ও লক্ষণ ধারণ করে তাহা ধর্ম । আর যাহা দুর্গতি হইতে প্রাণিকে ধারণ করে সেই পুণ্য কর্মও ধর্ম (সাংখ্যোরাও ইহা বলেন, যথা, ‘দুর্গতিপ্রপতৎ প্রাণিধারণাৎ ধর্ম উচ্যতে’—মাঠর বৃত্তি) । প্রথম ধর্মশব্দের অর্থ গুণ । যেমন, জলের ধর্ম, অগ্নির ধর্ম ইত্যাদি । বৌদ্ধেরা স্বকীয় দৃষ্টি অনুসারে বলেন ‘ধর্মধাতু নিঃসত্ত্ব নিজ্জীব’। অর্থাৎ ধর্ম phenomenon মাত্র উহাদের পশ্চাতে কিছু noumenon নাই । বৌদ্ধমতে ক্ষণে ক্ষণে ধর্মসকল উদিত হইয়া নিরুদ্ধ বা লীন হইতেছে ।

সাংখ্যপ্রমুখ আর্ষ সম্প্রদায় সকলের মতে—“যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তির নাম ধর্ম” । ফলত উভয় লক্ষণ একই । অর্থাৎ যাহার দ্বারা দ্রব্যকে জানি সেই জ্ঞাতগুণই ধর্ম । কিন্তু সাংখ্যীয় দৃষ্টিতে জ্ঞায়মান ধর্মের পশ্চাতে কতকগুলি (অসাংখ্য) এরূপ ধর্ম থাকে যাহারা সাক্ষাৎ বা জ্ঞায়মান নহে কিন্তু পূর্বে জ্ঞায়মান ছিল ও পরে হইবে । তাহাকে সাংখ্য ধর্মী বলেন । বৌদ্ধের ধর্মী নাই সবই ধর্ম । বৌদ্ধেরা বলিতে পারেন ধর্মীও অতীতানাগত ধর্মমাত্র সূতরাং সবই ধর্ম । সাংখ্যেরও তাহা সম্মত । যোগভাষ্যকার বলিয়াছেন ধর্মও ধর্মী হয়, যদি উপাদানরূপে কার্যের কারণ হয় । যেমন পরমাণুধর্ম সকল ভূতধর্মের ধর্মী বা কারণ । ঐরূপে মূল কারণে যাইলে ধর্মধর্মি ভেদ থাকে না । ত্রিগুণ এইজন্ত ধর্মও নহে এবং তাহাদের কারণভূত ধর্মীও নাই । বৌদ্ধেরা ঐরূপ কারণদৃষ্টি গ্রহণ না করিয়া সমস্তকেই ধর্ম বলেন আর ধর্মের পৃষ্ঠকে শূন্য বলেন । সাংখ্যেরা উহাকে অব্যক্ত ত্রিগুণ বলেন । শূন্য বলিলেও বৌদ্ধদেরকে ঐ শূন্য যে ‘নাস্তি’ নহে তাহা বলিতে হয় (নাগার্জ্জুনের পূর্বোক্ত বচন দ্রষ্টব্য) । শূন্যের সাধারণ অর্থ ও বৌদ্ধদের পারিভাষিক অর্থ লইয়াই সূতরাং গোল ।

পরিশেষে সাধন সম্বন্ধে বক্তব্য । সাংখ্য ও বৌদ্ধ উভয় পক্ষের সাধনেই চিত্তবৃত্তির নিরোধস্বরূপ যোগই মোক্ষের উপায় । উভয় মতেই ধ্যানের পরিপক্বাবস্থা সমাধি এবং সমাধিজাত প্রজ্ঞাই মোক্ষের কারণ । বৌদ্ধ-বিশেষ বলেন সমস্ত শূন্য জানাই সেই প্রজ্ঞা, আর সাংখ্য বলেন পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেকই সেই প্রজ্ঞা । উভয় দৃষ্টিতে ভেদ প্রতীত হইলেও ফলত বৌদ্ধ সাংখ্যের কথাই বলেন । কারণ সাংখ্যের সাধন—নমে নাহং নাশ্মি অর্থাৎ বিষয়, অহঙ্কার ও অশ্মিমাত্র মহান্ (উপনিষদের—অর্থ, জ্ঞানাত্মা ও মহান্ আত্মা) এই তিনই পুরুষ নহে, সূত্রাং ত্যাজ্য ; এবং ইহাদের ত্যাগ সিদ্ধিই সাংখ্যযোগের নির্বাণ মোক্ষ । বৌদ্ধেরা বলেন “শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্চোং পশ্চোং শূন্যং বহির্গতং .” একথার কি অর্থ হইতে পারে ? এক হইতে পারে শূন্য নামক দ্রষ্টব্য দ্রব্যকে ভিতরে বাহিরে দেখিবে । শূন্য যদি দ্রষ্টব্য না হয় তবে উহার অর্থ হইবে ভিতরে বাহিরে কিছু দেখিও না । উহাও কার্যাত “নমে নাহং নাশ্মি” সাধন । বৌদ্ধেরা বলেন নির্বাণে শূন্য থাকে বা শূন্যরূপে থাকে । উহাতে ছুই অর্থ হইতে পারে । প্রথম কিছু থাকে না, কারণ শূন্য থাকে উহার সাধারণ অর্থ ঐরূপ । আর দ্বিতীয় অর্থ নাগার্জ্জুনের মতে যে “শূন্যতা চ ন চোচ্ছেদঃ” আছে এবং বাহ্যকে ‘অস্তি না নাস্তি বলা বায় না তাহাই শূন্য’ এরূপ আছে, তাহাতে ফলতঃ কি অর্থ হয় ? নির্বাণের সময় কিছু থাকে বলিব না, কিছু থাকে না তাহাও বলিব না একথার বোধ্য অর্থ কি হইতে পারে ? কিছু ত বলিতে হইবে নচেৎ না বলাই দর্শন হয় । বলিলে বলিতে হইবে ‘দৃশ্য ধর্মশূন্য’ দ্রব্য থাকে । তাহাই সাংখ্যযোগের ত্রিগুণাতীত পুরুষ । সূত্রাং বৌদ্ধকে কিছু বলিলে উহাই বলিতে হইবে । তাহাতে বৌদ্ধের যে ক্ষতি নাই তাহা তাঁহারাই বলেন ‘চৈতন্যে চাত্মশব্দস্ত নিবেশেহপি ন নঃ ক্ষতিঃ’ (শাস্তুরক্ষিত) ।

সংসৃতির কারণকার্য-পরম্পরা বৌদ্ধেরা ঐসিদ্ধ প্রতীত্য-সমুৎপাদ প্রণালীর দ্বারা দেখান । তাহা যথা (আর্ব্যশালিস্তম্বসূত্রে)—‘অবিজ্ঞা-

২। ভূমিকা (নৈরাশ্র্যবাদ ও আশ্র্যবাদ) (৬৭)

প্রত্যয়া সংস্কারাঃ' অর্থাৎ অবিদ্যা হইলে বা অবিদ্যারূপহেতুতে সংস্কার, সংস্কার হইলে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইলে নাম (সংজ্ঞাদি অরূপ শব্দ) ও রূপ বা শব্দাদিরূপশব্দ, নামরূপ হইলে ছয় আয়তন বা মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, ষড়ায়তন হইলে স্পর্শ বা ইন্দ্রিয়জ্ঞান, স্পর্শ হইলে বেদনা বা সুখদুঃখ, বেদনা হইলে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইলে উপাদান বা তৃষ্ণার বিপুলতা, উপাদান হইলে ভব বা জন্মহেতু কর্ম, ভব হইলে জাতি বা জন্ম বা দেহধারণ, জাতি হইলে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌম্ব্যনশ্চ ও উপায়াসা (অন্ত্যাত্ম দুঃখ)। এইরূপে সংসার ও তজ্জনিত দুঃখ চলিতেছে। অবিদ্যা নিরুদ্ধ হইলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়। সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয় ইত্যাদি ক্রমে দুঃখনিবৃত্তিই নিব্বাণ। প্রজ্ঞাকরমতি অনেকস্থলে বলিয়াছেন "প্রতীত্যসমুৎপাদশ্চ চাচিন্ত্যত্বাৎ"। ইহার উদ্দেশ্যও আছে। প্রথমতঃ ঐ পরম্পরা অস্পষ্ট। অবিদ্যা কোন্ শব্দের অন্তর্গত? বলিতে হইবে বিজ্ঞান শব্দের। তাহাতে বিজ্ঞান হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে বিজ্ঞান একরূপ কথা বলা হয়। সাংখ্যেরা অবিদ্যাকে বিপর্যায়জ্ঞানবাসনা বলেন। নাগার্জুনের বৃত্তিকার চন্দ্রকীর্তিও ঠিক একরূপ লক্ষণ করেন। তাহাতে স্পষ্ট কথা হয় যে অজ্ঞান হইতে অজ্ঞান সংস্কার, তাহা হইতে পুনঃ অজ্ঞান বৃত্তি হয়। সাংখ্যেরা ইহাই বলেন। প্রত্যয় অর্থে বৌদ্ধেরা কারণ বলেন (হেতু অর্থে বৌদ্ধেরা অনেকস্থলে উপাদান কারণ বলেন ও সাংখ্যেরা নিমিত্ত কারণ অর্থে উহা ব্যবহার করেন)। প্রতীত্যসমুৎপাদের কারণ-কার্যতাও একরূপ অস্পষ্ট। বেদনা হইলে তৃষ্ণাদিক্রমে দুঃখ হয়। দুঃখও কিন্তু বেদনা। বেদনা হইতে রাগ দ্বেষ ও তনুলক কর্ম হয় তাহা হইতে পুনঃ কর্মজ দুঃখ হয়। ইহাই ঐ বিষয়ে স্পষ্ট কথা। উপাদান হইতে ভব ও ভব হইতে জাতি কিরূপে হয় তাহাও বুঝার বিষয়। এইসব কারণেই বোধ হয় উহা 'অচিন্ত্য' বলিয়া কথিত হয়। তদপেক্ষা সাংখ্যদের ষড়র সংসারচক্র স্পষ্ট ও অতিব্যাপ্তি দোষ হীন। সাংখ্যমতে রাগদ্বেষ হইতে

ধর্মাধর্ম্য কর্ম্ম (ও তজ্জনিত সংস্কার) হয়, ধর্মাধর্ম্য হইতে সুখদুঃখ হয়, সুখদুঃখ হইতে পুনঃ রাগদ্বेष হয় । এইরূপে ষড়র সংসারচক্র আবর্তিত হইতেছে । অবিद्या বা মিথ্যা জ্ঞান উহার নেত্রী । বিবেকরূপ বিদ্যার দ্বারা অবিद्या নাশ হইলে রাগদ্বেষ, ধর্মাধর্ম্য ও সুখদুঃখ নিবৃত্ত হইয়া শাস্বতী শান্তি হয় ।

সেই অবস্থায় আর্ম সম্প্রদায়দের মতে শান্ত (শান্তোপাধিক) আত্মা থাকেন আর বৌদ্ধদের মতে ‘শূন্য’ বা ‘অনাত্মা’ থাকে । আর্মদের লক্ষণে সেই পদ অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অচিন্ত্য (চিন্তার নিরোধে তৎপদে স্থিতি হয় বলিয়া), অগ্রাহ্য, অলক্ষণ (দৃশ্যলক্ষণহীন ; নচেৎ ইহাও তাহার লক্ষণ), অব্যপদেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, আত্মা (মাণ্ডুক্য) । নাগার্জুনও মধ্যমক কারিকায় সেই পদকে বলিয়াছেন “প্রপঞ্চোপশমং শিবং” । অদৃষ্টাদি বিশেষণও বৌদ্ধদের অনভীষ্ট হইবে না । কেবল “স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ” এই উপনিষদ্বাক্য তাঁহাদের অনভিমত হইবে । তৎপরিবর্তে তাঁহারা “স অনাত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ” এইরূপ বলিবেন । কার্য্যত কিন্তু ঐ ঋষিবাক্যই যে বলা হইবে তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে । সমাধিচ্ছ প্রজ্ঞার ও পরবৈরাগ্যের দ্বারাই ঐ পদ লভা, তাহাতে এবং অত্রিংশাদি শীল ও আসনাদি সমাধ্যক্ষ সাধন-বিষয়ে বৌদ্ধ সম্যক সাংখ্যের অনুবর্তী । তাঁহারা নিজেরাই উহা স্বীকার করেন । সাধন-বিষয় অনেক প্রপঞ্চিত করিলেও তদ্বিষয়ে বৌদ্ধেরা যোগশাস্ত্রের বহির্ভূত নূতন কিছু বলেন নাই, বলারও কিছু নাই ।

৩। ভূমিকা (শূন্যবাদ এবং বৌদ্ধদর্শন ও আত্মা)।

(১৩১৩ সালের হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত)

বৌদ্ধ দর্শনের 'শূন্য' শব্দের অর্থ অভাবমাত্র বুলিলে নিতান্তই ভুল বুঝা হয়। মাধ্যমিকায় উদ্ধৃত আছে "তথা অস্তীতি কাশ্যপ অয়মেকোহন্তঃ নাস্তীতি কাশ্যপ অয়মেকোহন্তঃ যদেতদুরোরন্তয়োগ'ধ্যং তদবাচ্যনিদর্শনম্ অপ্রতিষ্ঠমনাভাসমনিকেতম্ অবিজ্ঞপ্তিকমিদমুচ্যতে কাশ্যপ" অর্থাৎ 'অস্তি' এক অন্ত এবং 'নাস্তি' এক অন্ত,—এই দুই অন্তের মধ্যে যাহা তাহাকে অবাচ্য, অনিদর্শন, অপ্রতিষ্ঠ, অনাভাস, অনিকেত, অবিজ্ঞপ্তিক বলা যায়। ('অস্তি' ও 'নাস্তি'র মধ্যম পদার্থ নামক শূন্য ধরায় এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম মাধ্যমিক হইয়াছে)।

অন্যত্র যথা 'ন চাতাবোহপি নির্বাণম্ কুত এবাস্ত ভাবতা। ভাবাভাব-পরামশঙ্করঃ নির্বাণমুচ্যতে" (মাধ্যমিকা ২৫ অঃ)। অতএব নির্বাণ বা শূন্যতার স্থিতি ভাবও নহে অভাবও নহে, বলা হইল। যদিও এতাদৃশ লক্ষণ গ্রাসঙ্গত ও বোধ্য নহে, তথাপি 'শূন্য' যে অত্যন্তাভাবমাত্র নহে, তাহা উহা হইতে জানা গেল। 'শূন্যতয়াং কৌশিক তিষ্ঠতা বোধিসত্ত্বেন' এই প্রজ্ঞাপারমিতার বাক্যেও যখন শূন্যতার স্থিতি বলা হইল তখন শূন্যতাকে স্থিত বা সং পদার্থই বলা হইল।

আষ' দাশনিকেরাও প্রকৃতিকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করেন। যথা 'যত্তন্নিঃসত্তাসত্তং নিঃসদসং নিরসং অব্যক্তম্' (যোগভাষ্য) ইহাতে সত্তা (অর্থক্রিয়াকারিত্ব) ও অসত্তা, সং (ব্যক্ত) ও অসং একত্র উক্ত হইলেও উহা অর্থবিশেষে উক্ত হওয়াতে সম্পূর্ণ বোধ্য হইয়াছে।

এ বিষয় আরও বিস্তার করিয়া দেখা যাউক। কোন বিষয় আমরা বলিতে গেলে পদ বা বাক্যের দ্বারা বলি, অতএব সমস্ত বক্তব্য বিষয়ই পদার্থ। 'অস্তি' ও 'নাস্তি' ক্রিয়ার যোগে পদার্থ দ্বিবিধ—ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ। যাহা আছে তাহা ভাব, যাহা নাই তাহা অভাব, ইহা

ছাড়া আর তৃতীয় প্রকার পদার্থ হইতে পারে না, কারণ তাদৃশ পদার্থ আছে বলিলেই তাহাকে 'ভাব' বলা হইবে। কোন পদার্থের লক্ষণ করিতে কি কি নিয়ম অনুসরণীয় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) অভাব পদার্থের লক্ষণ করিতে হইলে যাহার অভাব তাহার অর্থাৎ প্রতিযোগী ভাবার্থ-পদের সহিত নিষেধার্থপদের যোগ করিতে হয়, যথা—অন্তের অভাব—অনন্ত, আত্মার অভাব—অনাত্মা।

(২) ভাবপদার্থের লক্ষণ করিতে হইলে কেবল নিষেধার্থপদের দ্বারা হয় না, ভাবার্থপদেরও যোগ থাকা চাই, যথা—বায়ুশূন্য, আলোকশূন্য স্থান। শুদ্ধ 'বায়ুশূন্য' 'আলোকশূন্য' ইত্যাদি অসংখ্য নিষেধার্থ পদ বলিলেও কখনও কোন ভাবপদার্থ লক্ষিত হয় না।

(৩) লক্ষণ করিতে নাহঁয়া 'অবাচ্য' 'অনভিলপ্য' প্রভৃতি পদ উল্লেখ করা কেবল বালকতা মাত্র। 'অবাচ্য' সম্বন্ধে চূপ করিয়া থাকাই উচিত। নচেৎ কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থকারের ন্যায় সহস্র সহস্র বাক্যের দ্বারা লক্ষণ ও বিবরণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে 'অবাচ্য' 'অনভিলপ্য' প্রভৃতি পদ প্রয়োগ করা ন্যায়প্রবণ মেধার পরিচায়ক নহে।

(৪) শক্তিরূপে স্থিতিকে (potential state) 'অব্যক্ত' পদের দ্বারা লক্ষিত করা ন্যায়সঙ্গত। অনুমানের দ্বারা শক্তির অস্তিত্বনিশ্চয় হইলেও তাহা কিরূপে আছে তাহা সাক্ষাৎকারবোধ্য নহে বলিয়া তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ স্মৃতি ধারণাবাচক পদের দ্বারা বচনীয় নহে। তাহান অবস্থিতির প্রকার ধারণাবোধ্য না হইলেও তাহার সত্তা অনির্বাচ্য নহে। তাহা অনুমান প্রমাণের বিষয় বলিয়া 'অস্তিত্ব'-পদের দ্বারা বাচ্য হয়।

('যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সত' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থে কোন কোন অজ্ঞানোক মনে করেন যে 'পরব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলাও যায় না, কিছু জানাও যায় না'। বস্তুত উহার অর্থ বাক্য 'ও মন নিবৃত্ত হইলে তবে পরব্রহ্মে স্থিতি হয়। সমগ্র সাধনের তাহাই উদ্দেশ্য)।

(৫) শুদ্ধ 'অস্তি' বা 'নাস্তি' বলিলে কোনও পদার্থের লক্ষণ করা হয় না। তাহাতে কেবল লক্ষিত পদার্থের সত্তা আছে কি না তাহাই বলা হয়। 'ঘটঃ অস্তি' বলিলে ঘট লক্ষিত হয় না। লক্ষিত ঘটের (অলক্ষিত হইলে কোনও অনির্দিষ্ট পদার্থের) নিশ্চয়তা আছে বলা হয়।

কতকগুলি ভাবের অস্তিতা বা নাস্তিতা, অথবা কতকগুলির অস্তিতা ও কতকগুলির নাস্তিতা না বলিলে কোনও পদার্থ লক্ষিত হয় না। অতএব 'শূন্য ভাবও নহে অভাবও নহে' অর্থাৎ অস্তি-নাস্তির সমন্বয় ইত্যাদি লক্ষণ করিতে যাইলে, নিরর্থক প্রলাপবাক্য বলা হয়। যাহা 'অস্তির' সহিত অসম্বন্ধিত তাহাই যখন, 'নাস্তি', তখন উহাদের সমন্বয় করা নিজের উক্তির বিরুদ্ধবাক্য কখনমাত্র। নির্বাণাদি উচ্চবিষয়ক বিচারে বুদ্ধি গুলাইয়া গেলেই লোকে ঐরূপ নিরর্থক অবোধ্য বাক্যের দ্বারা বিচারশাস্তির চেষ্টা পায়।

সমস্ত বুদ্ধেরাই যে ঐরূপে শূন্যের লক্ষণ করেন তাহা নহে। উহার ঞ্চায়ানুযায়ী লক্ষণও আছে। 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায়' শূন্যের এইরূপ লক্ষণ আছে—'ভগবানাহ, শূন্যমিতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। অনিমিত্তমিত্য-প্রণিহিতমিতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। অনভিসংস্কার ইত্যনুৎপাদ ইত্যনিরোধ ইত্যসংক্লেশ ইত্যাবাদানম্ ইত্যভাব ইতি নির্বাণমিতি ধর্ম্মধাতুরিতি তথৈতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে' (দ্বাদশ পরিবর্ত)। অর্থাৎ শূন্য অনিমিত্ত, অপ্রণিহিত, অনভিসংস্কৃত, অনুৎপাদ, অনিরোধ, অসংক্লেশ, অব্যবদান, অভাব, ধর্ম্মধাতু, নির্বাণ ও তথতা। তদ্ব্যতীত অন্যত্র শূন্যকে গন্তীর অক্ষর ও অপ্রমেয় বলা হইয়াছে।

উক্ত লক্ষণের মধ্যে 'অভাব' পদটি নিশ্চয়োজন বা নিরর্থক। ভাব মাত্রেরই নিষেধ যখন অভাব, তখন অনিমিত্তাদি অভাবার্থ পদসকল বলা বাহুল্যমাত্র; এবং ধর্ম্মধাতু প্রভৃতি ভাবার্থপদ বলাও স্বোক্তিবিরোধ। যাহা হউক উক্তলক্ষণে যদি বুদ্ধদেবের নিজোক্তি অনুসারে নির্বাণের স্থানে

‘পরম সুখ’ বা শান্তি বসানো যায় (‘নির্বাণম্ পরমং সুখম্’, ধর্মপদ) তাহা হইলে ঐ ‘শূন্য’, উপনিষদের আত্মা হইতে বিশেষ বিভিন্ন পদার্থ হয় না । যথা মাণ্ডুক্যে—‘নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞান-ঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্ অদৃষ্টম্, অব্যবহার্যমগ্রাহম্, অলক্ষণমচিন্ত্যম্ অবাপদেশম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তুং শিবমদ্বৈতং ।’

বৌদ্ধদের নিবেদনবাচক পদসমূহ এবং উপনিষদের নিষেধার্থক পদসমূহ কার্যত একই । অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির সম্যক নিরোধাবস্থা, শান্ত ও নির্বাণ একই পদার্থ ; শিব ও পরম সুখ একই বস্তু । বৌদ্ধভাষায় চিত্তের অবিকার বা পরিণামশূন্য অবস্থাই নিরোধাবস্থা, যথা ‘অবিকারায়ুগ্মন্ সারিপুত্রাবিকল্পা অচিন্ততা’ (অষ্টসা-প্রজ্ঞাপা, ১ বিবর্ত) । বৌদ্ধভাষায় চিত্ত তখন ‘নির্বাণ ধাতুতে’ স্থিত হয় । সাংখ্যের ভাষায় তাহা অব্যক্তে লীন হয়, বস্তুত উভয়ই এক কথা ।

একাত্ম প্রত্যয়সারের অর্থ—কেবল আত্মপ্রত্যয় বা দ্রষ্টৃভাব অবলম্বন করিয়াই আত্মা বোধগম্য । বৌদ্ধদেরও প্রকারান্তরে ইহাই স্বীকার করিতে হয়, তাহাদের চরম সমাধিতে এইরূপ হয় যথা ‘নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞানস্তায়তনং পশ্চতি শূন্যম্ ॥ সংজ্ঞাবেদয়িত্ত নিরোধঃ পশ্চতি শূন্যম্ ॥’ (নাগাজ্জুনীয় ধর্ম-সংগ্রহঃ) । ‘পশ্চতি’ ক্রিয়ার অবশ্য কর্তা থাকিবে, দ্রষ্টব্যতীত দর্শনকর্তা আর কে হইতে পারে ; (তবে কোন কোন বৌদ্ধমতে দেখা যায় ‘ন বিত্ততে সোঃপি কশ্চিৎ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্’ অর্থাৎ যে শূন্যতা ভাবনা করে সে কেহ নহে বা অসৎ । ঐরূপ বাক্যের অর্থ সাধারণ মানবের বুদ্ধি-বার সামর্থ্য নাই, কেবল মাধ্যমিকেরাই অর্থাৎ buddhist faithful রাই উহার অর্থ বুঝিতে পারেন) । অতএব ‘যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ’ ‘তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্’ এই যোগসূত্রদ্বয়ের অর্থকে বৌদ্ধশাস্ত্র অতিক্রমও করেনা, বিপর্যস্তও করে না ।

ধর্মধাতু ও তথতা বা ভূত তথতা অর্থে সাধারণ বৌদ্ধেরা যাহা বুঝেন

আর্ষশাস্ত্রের দিক্ হইতে তাহা ঠিক সম্যক্ বিবেক নহে। আর্ষ দার্শনিকেরা উহাকে বিশ্লেষ করিয়া চিৎ ও প্রধান নামে দুই মূল পদার্থ নিশ্চয় করেন। ধর্ম্মধাতু অর্থে ধর্ম্ম বা যাবতীয় প্রতীত্য পদার্থের ধাতু বা চরম অবস্থা। তথতা বা ভূততথতা অর্থেও তাহাই বুঝায়, এই বিক্রিয়মাণ চিত্তের মূলে যে বৃত্তিশূন্য, অবিকার, সংস্বরূপ, শুদ্ধ, সদাই একরূপ মূলভাব আছে তাহাই ভূততথতা।* কিন্তু সদাই একরূপ, শুদ্ধ, নির্বিকার (unchanging) পদার্থ কোনও কারণান্তর ব্যতিরেকে পরিণামবৃত্তি (phenomena) উৎপাদন করিতে সমর্থ বলিয়া কল্পিতও হইতে পারে না; সাংখ্যের নির্বিকার চিৎ ও বিকারী প্রধানের দ্বারাই উহা সুসঙ্গত হইতে পারে।

ঔপনিষদ-পুরুষ অর্থে আত্মশব্দ বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় না বটে কিন্তু আত্মার যাহা অর্থ আমাদের মোক্ষশাস্ত্রকারগণ করেন তাহা বৌদ্ধদের যে অসম্মত নহে তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধেরা যাহাকে 'সঙ্কারদিট্ঠি' নামক সংযোজন বা বন্ধন বলেন তাহা দেখিয়া অনেকে মনে করেন পুরুষতত্ত্ব বৌদ্ধশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বা আত্মার অভাব তাহাদের সম্মত। কিন্তু বস্তুতপক্ষে ইহা ভ্রান্তিমাত্র। আত্মা বা পুরুষ শব্দ বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যবহৃত

* Underlying the phenomena of mind there is an unchanging principle which we call the essence of mind. The fire caused by fagots dies when the fagots are gone but the essence of fire is never destroyed. The essence of mind is the entity without ideas and without phenomena and it is always the same. It pervades all things and is pure and unchanging. It is not untrue nor changeable, so it is also called Bhutatathata. (Out lines of the doctrine of the Mahayana Buddhists of Japan). শিকাগো ধর্ম্ম সভায় পঠিত।

না হইলেও পুরুষের যাহা লক্ষণ প্রায় তাদৃশ (অসংখ্য ধাতু) বৌদ্ধদেরও চরমগতি । কিঞ্চিৎ যে ‘আত্মাকে’ তাঁহারা মিথ্যা দৃষ্টি বলেন তাহার সহিত ঔপনিষদ পুরুষের কোনও সম্পর্ক নাই ।

মিলিন্দ পঞ্চগ্রন্থে রাজা মিলিন্দ নাগসেন ভিক্ষুকে প্রশ্ন করিতেছেন — “নাগসেন কে ? শরীরের ধাতু এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও চিত্তাদিই কি নাগসেন ?” তাহাতে নাগসেন উত্তর করিলেন যে উহার কোনটাই নাগসেন নহে । তখন রাজা বলিলেন তবে ধর্ম্মিষ্ঠ নাগসেন মিথ্যাবাদী, কারণ তিনি ঐ সমস্তকে নাগসেন বলিয়া পরিচয় দেন । এতদুত্তরে নাগসেন বলিলেন “মহারাজ ! আপনি কিসে করিয়া এখানে আসিয়াছেন ?” রাজা বলিলেন “রথে ।” নাগসেন বলিলেন “কৈ রথ ত দেখিতেছি না কেবল চক্র, যুগ, দণ্ড, নেমি ইত্যাদি দেখিতেছি, অতএব আপনি এতবড় রাজা হইয়া মিথ্যা কথা বলিলেন !” তখন মিলিন্দ রাজা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন যে দণ্ডচক্রাদি রথ নহে, কিন্তু উহার সমষ্টিই রথ । তাহাতে নাগসেন বলিলেন যে সেইরূপ শরীরচিত্তাদি-সমষ্টিই নাগসেন অন্য কিছু নহে !*

*পঞ্চস্কন্ধময় আত্মভাব ক্ষণিক ও প্রবাহনাত্মক, পুরুষের আত্মভাব প্রত্যয় ও পরক্ষণের আত্মভাব প্রতীত্য । একক্ষণিক আত্মভাব হইতে অন্যক্ষণিক আত্মভাব বা এক দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহ ধারণে অর্থাৎ প্রত্যয় হইতে প্রতীত্যে কিছু যায় না । ইহা বুঝাইবার জন্য মিলিন্দ প্রশ্নে দৃষ্টান্ত আছে, তাহা যথা—যেমন একটা প্রদীপ হইতে আর একটা দীপ জ্বালিলে পূর্ব দীপ পরের দীপে যায় না সেইরূপ বর্তমান ক্ষণের আত্মভাবরূপ প্রত্যয় হইতে পরক্ষণের আত্মভাবরূপ প্রতীত্য উৎপন্ন হইলেও তাহা হইতে কিছু আসে না । ইহা সদায় দৃষ্টান্ত, কারণ তৈলবর্ত্তিযুক্ত অন্য প্রদীপ থাকিলে এবং তাহাতে পূর্ব দীপ হইতে তাপ বাইলে তবেই অন্য প্রদীপ জ্বলে, আত্মভাব সম্বন্ধে তাহার সম্ভতি নাই ।

এইরূপ দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে শরীরচিত্তাদি পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত ‘আত্মা’ বৌদ্ধশাস্ত্রে নাই। বস্তুত কিরূপ আত্মা বৌদ্ধশাস্ত্রে অঙ্গীকৃত তাহা নিম্নোক্ত সঙ্কায়দিট্ঠির বিবরণ হইতে সম্যক বুঝা যাইবে। ধম্মসঙ্গনি নামক অভিধর্ম গ্রন্থে আছে—তথ কতমা সঙ্কায়দিট্ঠি। ইধ অস্মুত বা পুথুজ্জনো বা অরিয়ানং অদস্স নাবী অরিয়ধম্মস্স অকোবিদো অরিয়ধম্মে অবিনীতো ..রূপং অত্ততো সমনুপস্সতি রূপবন্তুং বা অত্তানং অত্তনি বা রূপং রূপস্মিং বা অত্তানং। অত্তনি বা রূপং রূপস্মিং বা অত্তানং। বেদনং অত্ততো সমনুপস্সতি বেদনা-বন্তুং বা অত্তানং অত্তনি বা বেদনা বেদনায় বা অত্তানং। সঞ্ঞং অত্ততো সমনুপস্সতি সঞ্ঞাবন্তুং বা অত্তানং অত্তনি বা সঞ্ঞং সঞ্ঞায় বা অত্তানং। সঙ্খারা অত্ততো সমনুপস্সতি সঙ্খারবন্তুং বা অত্তানং অত্তপি বা সঙ্খারে সঙ্খারেসু বা অত্তানং। বিঞ্ঞাণং অত্ততো...যা এব রূপা দিট্ঠি দিট্ঠিগত্তং দিট্ঠিগহনং দিট্ঠিকত্তারো, দিট্ঠি বিস্ককয়িকং দিট্ঠিবিপ্ফন্দিতং, দিট্ঠিসঞ্ঞাজনং, গাহো, পটিগ্গাহো, অভিনিবুসো, পরামাসো, কমগ্গো, মিচ্ছাপথো, মিচ্ছত্তং তীখ্যায়তনং বিপরিয়েসগাহো। ‘অরং বুচ্চতি সঙ্কায়দিট্ঠি’ (নিক্খেপ কণ্ডং। হংসাবতী পিটক, ১৫৭ পৃঃ)।

অর্থ—তন্মধ্যে সংকায়দৃষ্টি বা স্বকায়দৃষ্টি (বুদ্ধদ্বারা এই দ্বিবিধ অর্থ করেন) কি ? এই লোকে যে অশ্রুত পৃথগ্জনেরা আর্ষাদের বৃষ্টিতে পারে না, বা তাহাদের ধর্ম জানে না, ও সেই ধর্মে বিনীত নহে, তাহারা রূপকে বা ভৌতিক শরীরকে আত্মা-রূপে দেখে ও মনে জানে আত্মারই ইহা রূপ ও আত্মাতেই এই রূপ আছে ও রূপেতেই এই আত্মা আছে। এবং বেদনাকে (সুখ-দুঃখ-উপেক্ষা বোধকে) আত্মা-রূপে দেখে ও মনে করে আত্মারই এই বেদনা ও আত্মাতেই এই বেদনা আছে ও বেদনাতেই আত্মা আছে। এবঞ্চ সংজ্ঞা (শব্দাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়জ প্রাথমিক জ্ঞান বা আলোচন নামক জ্ঞান (বা perception), সংস্কার সকল ও বিজ্ঞান (চিন্তিত বিশেষ

জ্ঞান (বা conception) এই স্বকৃত্রয়কে আত্মা-রূপে দেখে ও মনে জানে আত্মারই তাহারা ও আত্মাতেই তাহারা এবং সেই সকলেই আত্মা আছে। এইরূপ যে দৃষ্টি (মত), দৃষ্টিতে বিচরণ, দৃষ্টিগহন, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টির ইন্দ্র-জাল, দৃষ্টির বিস্পন্দন বা সংঘর্ষ, দৃষ্টিসংযোজন বা বন্ধন আর সেই আত্ম-ভাবে যে ধরা ও নাছাড়া, যে অভিনিবেশ ও সংসৃষ্ট ভাব, যে কুমার্গ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাত্ব, তীর্থায়তন (শাস্ত্রবিস্তার) ও বিপর্যাসগ্রাহ—তাহাই সংস্কার দৃষ্টি বা স্বকার্য দৃষ্টি বলিয়া উক্ত হয়।

এই স্বকার্যদৃষ্টি বৌদ্ধমতে প্রধান বন্ধন। ঔপনিষদমতেও ঠিক তাহাই। মনোবুদ্ধিশরীরাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অবিচ্ছিন্ন প্রধান বন্ধন। কলতঃ বৌদ্ধেরা পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিবিশেষকে ‘আত্মা’ শব্দের দ্বারা অভিহিত করেন, ঔপনিষদেরা তাহা করেন না। বৌদ্ধেরা বলেন পঞ্চস্কন্ধ ভূষণস্কয়ের দ্বারা নিরুদ্ধ হইলে নির্বাণ হয় (বান বা ভূষণের অভাবই নির্বাণ)। ঔপনিষদেরা বলেন বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে শিবস্বরূপ আত্মার সৃষ্টি হয়। নির্বাণেও দুঃখের নিবৃত্তি আত্মসংস্কারেও দুঃখের নিবৃত্তি। অতএব স্পষ্টই বুঝা গেল, বৌদ্ধেরা যাহাকে নির্বাণ বা ‘অসঙ্গতধাতু’ নাম দেন, ঔপনিষদেরা তাহা পদার্থকেই ‘আত্মা’ নাম দেন। বৌদ্ধেরা বলেন পঞ্চস্কন্ধের চরম অবস্থা ‘শূন্য’ ঔপনিষদেরা বলেন চিত্তাদির চরম অবস্থা অব্যক্ত।

বৌদ্ধেরা বলেন ‘নির্বাণম্ পরমং সুখং’ কিন্তু এই সুখের অনুভাবিতাকে ? তাহাতে উত্তর দেন অর্হতেরা। আরও বলেন বেদনা স্বক্কের স্তম্ভ পরিচ্ছিন্ন এবং পরম সুখ সম্পূর্ণ পৃথক্ লক্ষণ ; কারণ নির্বাণ ‘অসঙ্গতধাতু।’ কিন্তু পঞ্চস্কন্ধের শূন্যতাই যখন নির্বাণ তখন পঞ্চস্কন্ধশূন্য পৃথক্ অর্হৎ কি বা কে হইবেন—যিনি নির্বাণসুখের অনুভাবিতা ? অতএব নির্বাণ সুখকে স্বয়ংবোধরূপ বলা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।^১ ঔপনিষদেরা আত্মাকে তাহাই অর্থাৎ শাস্ত্র বলেন।

মিলিন্দ পত্রঃ্ গ্রন্থে নির্বাণকে ‘একন্তু সুখং’ বলা হইয়াছে, আর তাহাকে বিমুক্তিসুখও বলা হয় যথা, ‘বিমুক্তিসুখং পটীসম্বোধি’ (পটীচ্চ সমুপ্পাদ) । ফলকথা নির্বাণ অর্থে বান বা তৃষ্ণাশূন্যতা, সর্বশূন্যতা নহে ।

অভিধর্ম্মাৎ সঙ্গহে আছে ‘পদমচ্চুত মচ্চন্তুমসঙ্খতম্নুত্তরং । নির্বাণ-
মিতি ভাসন্তি বানমুক্তা মহেসরো ॥’ অর্থাৎ অচ্যুত, অত্যন্ত, অসঙ্খত,
অল্পত্তর পদকে বাণমুক্ত মহর্ষিরা নির্বাণ বলেন । এই লক্ষণে অচ্যুতাদি
চারিটি প্রতিষেধার্থক পদ আছে বটে কিন্তু পদশব্দ ভাবার্থক । নির্বাণকে
যে শূন্য, অনিমিত্ত ও অপ্রণিহিত বলা হইয়াছে সেই সকলের অর্থ উক্ত
হইতেছে । রাগ দ্বেষ ও মোহের ‘আরম্মণ’ বা বিষয় এবং ‘সম্পযোগ’ বা
সাহচর্যা ও সহভাব-(একুপ্পাদ, এক নিরোধ) শূন্যতাহেতুই নির্বাণ শূন্য ।
আর রাগাদি প্রণিধি-(উদ্দেশ্য) রহিতত্ব হেতু অপ্রণিহিত । অথবা
সংস্কার, সংস্কাররূপ নিমিত্ত ও সংস্কাররূপ প্রণিধিরহিতত্বহেতু নির্বাণ শূন্য,
অনিমিত্ত অপ্রণিহিত । ইহা বিশুদ্ধিমার্গে ইন্দ্রিয়সচ্চনির্দেশ পরিচ্ছেদে
সম্যক্ বিবৃত আছে । অতএব নির্বাণ রাগাদিশূন্য হইলেও ‘পরমং সুখং’
‘একন্তুসুখং’ বা ‘বিমুক্তিসুখং’ ইত্যাদি কিন্তু শূন্য নহে ।

বৌদ্ধদের অভিধর্ম্মশাস্ত্রে নির্বাণকে অসঙ্খত ধাতু বলা হয় । অসঙ্খত
বা অসংস্কৃত অর্থে ভাগশূন্য বা অসংযোজক অর্থাৎ যাহা বহুভাগের রাশি
বা সমষ্টিস্বরূপ নহে । ধাতু অর্থে মূলভাব । বৌদ্ধ দশনে ধাতুশব্দের অর্থ
বিচার করিলে তাহা শক্তির সমলক্ষণ হয় । তন্মতে ধাতু অষ্টাদশ সংখ্যক
যথা, চক্ষু ধাতু, চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞান ধাতু ইত্যাদি ।
‘মনোবিজ্ঞান ধাতু সম্ফস্ফজং’ অর্থাৎ ‘মনোবিজ্ঞানের বা মানস বিষয়ের
বিজ্ঞানধাতুর সহিত সংস্পর্শজ জ্ঞান’ ইত্যাদি বাক্য হইতে ধাতুপদার্থের
দ্বারা চক্ষু-আদির শক্তিরূপ অকল্পনীয় ভাবই লক্ষিত হয় । বিভাবিনী
টীকাকার ধাতুর এইরূপ অর্থ করেন যথা—“অন্তনো সভাবং ধারেত্তীতি
ধাতুয়ো অথবা যথা সন্তবং অনেকপকারং সংসার দুঃখং বিদধন্তি” (৭ম

পরিচ্ছেদ) । স্বভাব ধারণ করাও শক্তির কার্য, কারণ চক্ষুঃশক্তিই চক্ষুর স্বভাব ধারণ করিয়া রাখে বলা যাইতে পারে । আর 'ধাতু কুসলতা' অর্থে শক্তির উৎকর্ষ বলিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হয় ।

অট্টকথাকার বুদ্ধঘোষ ধাতুর ব্যাখ্যাকালে নিঃসত্ত্ব ও নির্জীবত্ব পুনঃ পুনঃ স্বরণ করাইয়া দিয়াছেন । নিঃসত্ত্ব অর্থে যে একেবারে নাই—এরূপ নহে তাহা হইলে অসঙ্খত ধাতুর এত বিবরণ দিবার কি প্রয়োজন ছিল, অসং পদার্থের উল্লেখ না করিলেই হইত । বৌদ্ধশাস্ত্রে সত্ত্ব অর্থে প্রতীতভাব বা phenomenon তজ্জনা পঞ্চস্কন্ধের বা প্রতীত ভাবের সমষ্টিবিশেষের নাম সত্ত্ব বা জীব । অতএব নিঃসত্ত্ব অর্থে প্রতীত্য ভাবের ন্যায় সত্ত্বাশূন্য । আর, নির্জীব অর্থে জীবনশূন্য অথবা 'বেদগু'শূন্য বা জ্ঞাতৃত্বশূন্য । চক্ষু-রাদির শক্তিরূপ মূলভাবকে জীবনশূন্য (কারণ জীবনও phenomenon এর অন্তর্গত) বা বেদগুশূন্য বলিলে সাংখ্যের সহিত কিছুই বিরোধ হয় না ; কারণ সাংখ্যমতেও সমস্ত বিকার অচেতন ত্রিগুণোপাদানক । আর অসঙ্খত ধাতুকে এবং পরমসুখকেও জীবনশূন্য ও বেদগুশূন্য বলিলে কোন ক্ষতি নাই কারণ তাহার আর স্বতন্ত্র বেদগু কে থাকিবে ?

শাস্ত্রতদৃষ্টি নাম শুনিয়া অনেকে ভ্রান্ত হন, ব্রহ্মজ্ঞান সত্ত্ব হইতে তাহার সংক্ষিপ্ত অন্তবাদ দিতেছি, পাঠক দেখিবেন আশ্চর্যের সহিত বিরুদ্ধতা বিমরে উহার কোনও সম্বন্ধ নাই । (বুদ্ধ বলিতেছেন) “এই ভিক্ষুগণ, কোন কোন শাস্ত্রবাদী ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ আছেন, যাহারা আত্মা ও লোককে শাস্ত্রত্ব বলেন । তাঁহারা কি গতির দ্বারা ও কি অবলম্বন করিয়া উদ্ধা বলেন ? তাঁহারা বীর্ঘ্য, যোগ, অপ্রমাদ ও সন্যাস মনসিকারের দ্বারা সমাধিলাভ করিয়া সেই সমাধিবলে পরিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা এক, দুই, দশ, শত, সহস্র, শতসহস্র বা ততোধিক পূর্ক জন্ম স্বরণ করিতে পারেন । তাঁহারা জানিতে পারেন যে আমরা অমুক অমুক নামে এতকালে উৎপন্ন হইয়াছিলাম । তাহাতে তাঁহারা মনে করেন যে এই লোক ও আত্মা

শাশ্বত, কৃষ্ণ ও ঐষিকস্থায়িরূপে স্থিত। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেরা সন্ধাবিত (বিপ্লুত) হয় এবং সংসারচ্যুতি ও উৎপাদ প্রাপ্ত হয়।” ইহাই শাশ্বত বাদ। ব্রহ্মজাল সূত্রে এই বাদ হইতে আরম্ভ করিয়া চারি ‘আরুপায়তনানুপগদেবত্ব’ (যোগশাস্ত্রের বিদেহলীন দেবত্ব) পর্য্যন্তকে মিথ্যাদৃষ্টি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাতে কৈবল্যাপেক্ষা সালোকা, সারূপ্য, সাস্ট্রি’ আদি লগুণ মুক্তির হেয়তামাত্র উক্ত হইল। কৈবল্যবাদী ঋষিগণও এইরূপ বলেন। সর্বজ্ঞাত্ব ও সর্বভাবাধিষ্টাত্বরূপ ব্রহ্মলোকের পরম ঐশ্বর্যোও বিরাগবান্ হইলে তবে কৈবল্য হয়।

পরন্তু বৌদ্ধভাষায় যাহা ‘আত্মা’ আৰ্যভাষায় তাহা অনাত্মা। অভিধানের বৈপরীত্য থাকিলেও অভিধেয় পদার্থ এক। যেহেতু পঞ্চস্কন্ধময় উপাধিকে বৌদ্ধেরা ‘আত্মা’ নামে অভিহিত করেন আর আৰ্যমতে তাহাই অনাত্মা। নির্বাণের পরম সূত্রে বৌদ্ধেরা আত্মা বলিতে অনিচ্ছুক, তৎপক্ষে এই যুক্তি দেন যে ব্যবহারিক আত্মা ও নির্বাণসূত্র যে পৃথক তাহা লক্ষ্য করা কর্তব্য। ঋষিগণও ব্যবহারিক আত্মাকে অনাত্মা বলিয়া ঠিক তাহাই লক্ষ্য করান। ফলতঃ একই বাচ্য পদার্থের এই বাচক-বৈপরীত্য অবলম্বন করিয়’ পরবর্তী সম্প্রদায়ালিম্যানিগণ তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া গিয়াছেন এবং অত্যাধিক অনেক সুললিত ব্যক্তিগণের ইহা বুদ্ধিমোহ উৎপাদন করে।

যদি ব্যবহারিক আত্মা (বৌদ্ধদের অত্মা) ও নির্বাণসূত্র সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য হয় তবে এই ‘আমি’ কেন নির্বাণের জগ্নু মহান্ প্রযত্ন করিবে ? বস্তুত এই ‘আমি’ বৈরাগ্যের দ্বারা স্বীয় অঙ্গচ্ছেদ করিতে করিতে নির্বাণসূত্রে বাইয়া উপনীত হয়। তজ্জনা ঋষিরা নির্বাণকে আমিত্বের প্রকৃত স্বরূপ ও ব্যবহারিক আমিত্বকে মিথ্যা বা অযথারূপ বলেন। ‘আমি নির্বাণ পাইব’—এই আশা নির্বাণলাভ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে অতএব এই আমিত্বকে নির্বাণ সূত্রের সহিত সম্বন্ধশূন্য বলা বাইতে পারে না।

বৌদ্ধেরাও বলেন ‘তথাগতো বিমুক্তিসুখং পটিসম্বোধি’ অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধান্তর্গত তথাগতের বিমুক্তিসুখ প্রতিসংবেদ্য পদার্থ হইল। সাংখ্যেরাও বুদ্ধি ও পুরুষের প্রতিসংবেদন সম্বন্ধ স্বীকার করেন।

অতএব নির্বাণ অর্থে অভাবপ্রাপ্তি নহে তাহা স্বরূপে স্থিতি। বৌদ্ধেরা পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিবিশেষকে আত্মা-নামে অভিহিত করেন আর তাহার নিরোধ হইলে যে ‘অনন্ত’, অনূৎপন্ন, অসঙ্খ্যত ধাতুরূপ পরমসুখ থাকে তাহাকে অনাত্মা (পঞ্চস্কন্ধাতীত) নাম দেন। আর ধর্মিরা সেই পঞ্চস্কন্ধসমষ্টিকে অনাত্মা বলেন এবং নির্বাণের স্বয়ংবোধকে স্বরূপ আত্মা বলেন। অতএব বৌদ্ধদের বলিতে হয় আত্মজ্ঞানরূপ ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া আত্মাতীত নির্বাণসুখ লাভ কর, আর ধর্মিদের বলিতে হয় অনাত্মজ্ঞানরূপ ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া স্বরূপ আত্মার স্থিতি হও। সূত্রাং বাচক ভিন্ন হইলেও বাচ্য অভিন্ন।

ফলত বৌদ্ধদের আদর্শ ও ধর্মনীতি যেমন উৎকৃষ্ট তাহাদের দর্শন ^{স্বরূপ নহে।} ইহার কয়েকটা সঙ্গত কারণ আছে, যথা—

(১) বুদ্ধদেব যে আন্বীক্ষিকী (metaphysics) সম্বন্ধে কোন উপদেশ করিতেন না তাহা পালি বৌদ্ধশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। যাহারা সমাধিসিদ্ধ মহাপুরুষ তাহারা সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ হওয়াতে সাধারণ লোককে পরমার্থ নিশ্চয় করাইবার জন্য যুক্তি বা অনুমানমূলক দর্শন শাস্ত্রের তত প্রয়োজন হয় না, উদাহরণের অসাক্ষাতেই দর্শনশাস্ত্র অধিক ফলদায়ী। অতএব বুদ্ধিতে হইবে বৌদ্ধদর্শন বুদ্ধের নহে বুদ্ধের ভক্তগণের। বুদ্ধের ২৫ শত বর্ষ পর হইতে সহস্রাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রকারেরা আন্বীক্ষিকীর প্রভূত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, নচেৎ আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইত না।

(২) মহাপুরুষদের ভক্তগণের জন্যই আমরা তাহাদের যথাযথ বিবরণ পাই না, ভক্তেরা সত্য বিবরণ না দিয়া যাহা নিজেরা সত্য ও উপযুক্ত

৩। ভূমিকা (শূন্যবাদ...আত্মা) (৮১)

মনে করেন তাহাই বলেন এবং মহাপুরুষদের মুখ দিয়া বলান। বুদ্ধকে খ্যাতি করিতে বাইরা তাঁহার ভক্তগণ কত যে অলীক, অবাস্তুর ও অপ্রয়োজনীয় কল্পনার উদ্ভাবনা করিয়াছেন তাহা গণনা করা যায় না। দর্শন সম্বন্ধেও ঐরূপ। পূর্ব হইতেই মোক্ষমার্গ ও মোক্ষশাস্ত্র প্রচলিত থাকিলেও, অপিচ তৎসম্বন্ধে কোনও মৌলিক কথা বলিবার না থাকিলেও স্বসম্প্রদায়ের বিশিষ্টতা স্থাপনের জন্য বুদ্ধভক্তগণকে অভিনব আকারের বাদ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে নচেৎ গুরু মৌলিকতা স্থাপিত হয় কিরূপে? এইজন্য বুদ্ধদেব পারদর্শী হইলেও বৌদ্ধ দর্শন সদোষ হইয়াছে।

(৩) বহুবর্ষ পূর্বে যাহা ঘটয়াছে তাহা পরে লিপিবদ্ধ করিতে যাইলে যে কত দোষ হয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধের মুখ দিয়া যে সমস্ত সংবাদ বলান হইয়াছে তাহার অধিকাংশই বহুবর্ষ বা শতাব্দী পূর্বকার বুদ্ধের কথাবার্তা অবলম্বন করিয়া রচিত হওয়াতে কেহ যদি তাহা সব যথাযথ বুদ্ধের উচ্চারিত কথা মনে করেন তবে ভ্রান্ত হইবেন। তজ্জন্য তাদৃশ শাস্ত্রের দোষের জন্য উপদেষ্টা পুরুষ দাঙ্গী ^{সহন}। বর্তমান পালিভাষা বুদ্ধের সময়ে ছিল কিনা তাহাতেও কেহ কেহ সংশয় করেন। অশোকের লিপিতে উহার ব্যবহার নাই।

(৪) বুদ্ধদেবের নির্বাণের পরেই তদীয় শিষ্যগণের মধ্যে নানা মতভেদ হয়। তখন প্রধান প্রধান শিষ্যগণের যাহা অভিমত ও যাহা স্মরণ ছিল তাহা লইয়াই বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত হয়। তন্মধ্যে কাশ্যপ অভিধম্ম বা বৌদ্ধদর্শনের গ্রন্থ রচনা করেন। সমস্ত অভিধম্ম যে এক সময়ে রচিত হয় নাই তাহারও প্রমাণ আছে। আর্ষদর্শনের বিষয় সকল যেরূপ স্পষ্ট সংক্ষিপ্ত ও অনবদ্য সূত্রে রচিত বৌদ্ধদর্শন ঠিক তাহার বিপরীত। শব্দ-বাহুল্যময় ঐ শাস্ত্র বহুবর্ষ কণ্ঠে কণ্ঠে থাকিলে যে কিরূপ বিপর্যাস্ত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমের। তবে বুদ্ধদেব গাথাতে যে সব উপদেশ দিয়াছেন তাহা অদ্বষ্ট থাকিবার কথা, তাই ধর্মপদ এরূপ অনবদ্য।

(৮২)

প্রজ্ঞা পারমিতা:

ফলে বৌদ্ধদের দর্শনের কিছু কিছু দোষ থাকিলেও তাঁহাদের মোক্ষ-
মার্গের কিছু দোষ নাই, কারণ বুদ্ধদেব উহারই সম্যক শিক্ষা দিয়াছিলেন।
আর তাঁহার নিক্কাণ মার্গের সহিত আর্য নিক্কাণ মার্গেরও যে বিশেষ কিছু
ভেদ নাই তাহাও দেখান হইয়াছে। তাঁহার 'ধর্মপদের' গ্রায় ধর্মনীতি
এবং তাঁহার গ্রায় মুমুকুদের আদর্শ জগতে হুল'ভ।

প্রজ্ঞা পারমিতা

(বোধিচর্যাবতারের নবম পরিচ্ছেদস্থ)

বৌদ্ধদের দশটি পারমিতা বা পারগামী কুশলাচরণ আছে। তাহারা যথা—দান, শীল, ক্ষান্তি, উপায়, বল, প্রণিধি, জ্ঞান, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা। যাহারা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন তাঁহাদের নাম বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বেরা বুদ্ধ হইবার পূর্ব পূর্ব জন্মে দানাদি নিয়ম পারমিতা আচরণ করেন। শেষ জন্মে সন্ন্যাস লইয়া ধ্যানাদি আচরণ করিয়া সমাধিসিদ্ধি করেন ও তদ্বারা প্রজ্ঞা লাভ করেন। তখন ত্যাগই করেন, দানাদি নিয়ম পারমিতা করেন না। এই সমাধিজাত প্রজ্ঞার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। অষ্ট সাহস্রিকা, পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা, শতসাহস্রিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংস্কৃত প্রজ্ঞাপারমিতা নামক ত্রিপেটকের গ্রন্থ আছে। বোধিচর্যাবতার গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদের নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। তাহা অনূদিত করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। প্রজ্ঞাপারমিতা দেবতার গায় বৌদ্ধদের পূজ্য। ‘নমস্তস্মৈ ভগবতৌ প্রজ্ঞাপারমিতেহমিতে’ ইত্যাদিরূপ প্রজ্ঞাপারমিতার স্তুতি আছে।

ইমং পরিকরং সর্বং প্রজ্ঞার্থং হি মুনির্জগৌ ।

তস্মাদুৎপাদয়েৎ প্রজ্ঞাং দুঃখনিবৃত্তিকাক্ষয়া ॥ ১

১। এই (পূর্বোক্ত) পরিকর বা সাধনসমূহ কেবল প্রজ্ঞারই জগু, ইহা মহামুনি বলিয়াছেন। অতএব দুঃখ-নিবৃত্তির ইচ্ছায় প্রজ্ঞাকে উৎপাদন করিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদের চতুর্থ শ্লোকে শমথ এবং বিপশ্চনার কথা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিল। ঐ দুইটিই নির্বাণ সাধনের মুখ্য অঙ্গ। তন্মধ্যে শমথ বা সমাধির সাধন ধ্যানপারমিতার উক্ত হইয়াছে। বিপশ্চনা অর্থে সমাধি-জাত প্রজ্ঞা। তাহার স্বরূপ কি তাহা এই পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

চিত্তের সমাক্ স্তৈষ্যাকে শমথ বলে। তাহা ধ্যানের সম্যক্ নিশ্চলতা। পাতঞ্জল শাস্ত্রে আছে যে ‘তদেবাব্যমাত্র-নির্ভাসং স্বরূপশৃঙ্খমিব সমাধিঃ,’ বৌদ্ধেরা ঠিক উহাকেই সমাধি বলেন এবং আসীন হইয়া ধারণাধ্যানের অভ্যাস এবং বৈরাগ্য করিয়া (সাংখ্যযোগীদের ন্যায়) সমাধির সাধন করেন। যোগশাস্ত্রে আছে সমাধি হইলে যথাভূত প্রজ্ঞা হয় (‘‘তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ’’) বৌদ্ধেরাও বলেন ‘‘সমাহিতো যথাবজ্জানা তীতু্যক্তবান্ মুনিঃ’’। ‘‘সমাহিতচেতসো যথাভূতঃ দশনং ভবতি’’ (ধর্ম্মসঙ্গীতি সূত্র)।

সমাহিত চিত্তের এই যে প্রজ্ঞা তাহা অসমাহিত-চিত্ত শাস্ত্রকারদের দ্বারা আর্ষ ও বৌদ্ধাদি শাস্ত্রে প্রপঞ্চিত হওয়াতে কিছু কিছু ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু দৃশ্যজ্ঞানের সমাক্ নিরোধই যে সেই প্রজ্ঞার ফল তদ্বি-যয়ে আর্ষ ও বৌদ্ধাদি নির্বাণবাদীরা সকলেই একমত। দৃশ্যের স্বরূপ কি তদ্বিষয়ে সাম্প্রদায়িকদের মতভেদ আছে কিন্তু প্রায়শঃ তাহা অভিধেয় শব্দ লইয়াই ভেদ। আর্ষ ও বৌদ্ধদের মুখ্য ভেদ আত্ম-পদার্থ লইয়া। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে পাঠক দেখিবেন যে একই দৃশ্য পদার্থকে আর্ষনির্বাণ-মার্গীরা অনাত্মা বলেন; আর বৌদ্ধেরা ঠিক তাহাকে ‘‘আত্মা’’ বলেন। সূত্ররূপে আর্ষভাষায় অনাত্ম ভাব হের আর বৌদ্ধ ভাষায় আত্মভাব হের। আর্ষ ভাষায় অনাত্ম দৃশ্যভাব ত্যাগ করিলে যাহা থাকে তাহাই ‘‘আত্মা বা পুরুষ,’’ আর বৌদ্ধ ভাষায় আত্মাকে ত্যাগ করিলে যাহা থাকে তাহাই ‘‘অনাত্মা’’। এই দৃশ্যত্যাগ কার্য্যত উভয় সম্প্রদায়ের একই। সূত্ররূপে শেষে যাহা থাকে তাহাও এক, কিন্তু সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা।

এই চরম পদার্থকে বৌদ্ধেরা শূন্য বলেন। কিন্তু “অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায়” আছে “শূন্যরূপেণ কৌশিক তিষ্ঠতি” ইত্যাদি। অর্থাৎ শূন্যও ‘আছে’ বা ভাব পদার্থ। কিন্তু কোন কোন স্থলে আবার তাহাকে “অভাব” বলাতে অনেক গোল হইয়াছে এবং আর্ষশাস্ত্রকারেরা তাহা ধরিয়া বেশ সঙ্গতভাবে তাহা নিরাস করিতে পারিয়াছেন। আবার বৌদ্ধেরাও আর্ষদের আশ্রয়ক ধরিয়া তাহাকে ব্যবহারিক আত্মা মনে করিয়া আর্ষমত নিরাসে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বলা বাহুল্য এই চরম পদার্থ দৃশ্যাতীত বা absolute দ্রষ্টা। তাদৃশ পদার্থের লক্ষণ করিতে হইলে সমস্ত দৃশ্যধর্মের নিষেধ করিতে হয়। আর্ষদের আত্মার লক্ষণেও “অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অচিন্ত্য” ইত্যাদি দৃশ্য ধর্মের নিষেধ দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাদৃশ পদার্থকে শুদ্ধ ‘অভাব’ “অনাত্মা” বলিলে চলে না, তাই আর্ষশাস্ত্রে তাহার ভাববাচী “আত্মা বা পুরুষ” আখ্যা আছে। আর বৌদ্ধদেরকেও ‘শূন্য আছে’ এরূপ বলিতে হয়। এইরূপ আখ্যাভেদ লইয়া সাম্প্রদায়িকগণ অনেক বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। আর্ষগণের মতে বাহাতে আত্মাভিমান হয় বা আছে তাহা অনাত্মা ও আত্মা হইতে ব্যতিরিক্ত। বৌদ্ধেরাও বলেন আত্মাই অনাত্মা। আর্ষগণ কূটস্থ বা নির্বিকার চৈতন্য পদার্থকে অবিকারী ভাব বলেন, আর বৌদ্ধগণ তাহাকে অবিকারী শূন্য বা অভাব বলেন। যাহাকে ‘তিষ্ঠতি’ বলিতে হয় তাহাকে সম্পূর্ণ অভাব বলিলে যে ভাষার দোষ হয়, সূতরাং ভাষাময় শাস্ত্র-রচনাও চলে না তাহা বিজ্ঞ পাঠক বুঝিবেন। এই দুর্বলতার জন্য শেষে বৌদ্ধমত পরাভূত হইয়া ভারত হইতে অন্তর্হিত হয়। কার্যত কিন্তু স্বশাস্ত্রোক্ত নির্বাণমার্গের সাধন করিলে বৌদ্ধেরা আর্ষদের নির্দিষ্ট সেই চরম পদেই যাইবেন, কারণ বৌদ্ধগণ সাংখ্যযোগ হইতে সমাধন সমাধি এবং সমস্ত দৃশ্যপদার্থে বৈরাগ্য এই দুই প্রধান বিষয় সম্যক গ্রহণ করিয়াছেন।

সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং মতং ।

বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃতিরূচ্যতে ॥২

২। সংবৃতি সত্য ও পরমার্থ সত্য এই দ্বিবিধ সত্য স্বীকৃত হয়। তন্মধ্যে বুদ্ধির বা জ্ঞানশক্তির যাহা অবিষয় তাহাই পরমার্থ সত্য বা তত্ত্ব এবং যাহা বুদ্ধিগোচর তাহা সংবৃতি সত্য।

সংবৃতি অর্থে অবিজ্ঞা। অবিজ্ঞা = যাহাতে অভূত বিষয় খ্যাপিত হয় এবং যথাভূত বিষয় আবৃত হয়, তাদৃশ বিপরীত জ্ঞান, যথা—“অভূতং খ্যাপয়ত্যর্থং ভূতমাবৃত্যবর্ততে।” তাদৃশ অবিজ্ঞাবহুল বিষয় সাধারণ ব্যক্তিদের নিকট যাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় তাহাই সংবৃতি সত্য, যথা—“সত্যং তয়া (সংবৃত্য অবিজ্ঞা বা) খ্যাতি বদেব কৃত্রিমং। জগাদ তৎসংবৃত্তিসত্যমিত্যাदि”—অর্থাৎ ছয় ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য বিনা যে গ্রাহ্যের গ্রহণ হয় তাহাই লৌকিক বা সংবৃতি সত্য। তাহা ছাড়া যে কল্পিত বিষয় তাহাই সংবৃতি মিথ্যা।

—পরমার্থশ্চ সত্যে এই উভয়ই (সংবৃতি সত্য ও সংবৃতি মিথ্যা) মিথ্যা বলিয়া অবভাত হয়। পরমার্থ = উত্তমার্থ, যাহার অধিগম হইলে অকৃত্রিম বস্তুত্বের বিজ্ঞান হইয়া সমস্ত সংবৃতিবাসনানুসন্ধী ক্লেশের সম্যক্ প্রহাণ হয়। এই পরমার্থের অন্য নাম সর্বধর্মের নিঃস্বভাবতা, শূন্যতা, তপতা, ভূতকোটি, ধর্মধাতু ইত্যাদি। এইরূপ যে শূন্যতা তাহাই পরমার্থ সত্য। বৌদ্ধদের শূন্যতা বা অভাব সর্বস্তলে অভ্যন্তাভাব অর্থে ব্যবহৃত হয় না, কারণ বৌদ্ধ ভাষায় “ভাব” অর্থে “যাহা প্রত্যয় হইতে হয় (ভবন্তি) বা স্বরূপ লাভ করে তাহাই ভাব”। সুতরাং যাহা প্রত্যয় বা কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না তাহা “অভাব”, সুতরাং তাহা কারণহীন সত্তাও হইতে পারে। তাহা হইলে আর্ষমতের সহিত ভেদ প্রধানতঃ শব্দার্থের ভেদমূলক।

তত্র লোকে দ্বিধা দৃষ্টো যোগী প্রাকৃতকস্তথা।

তত্র প্রাকৃতকোলোকে যোগিলোকেন বাধ্যতে ॥৩

৩। সেই দুই সত্য অনুসারে লোকও দ্বিবিধ দৃষ্ট হয়, তাহা যথা যোগিলোক ও প্রাকৃত লোক। তন্মধ্যে প্রাকৃতলোক যোগিলোকের দ্বারা বাধিত হয়।

লোক অর্থে সমুদায় বা জ্ঞানের রাশি। যোগ অর্থে সমাধি বা সর্ব-ধর্মের অনুপলব্ধি। তাদৃশ যোগযুক্তের নাম যোগী। প্রকৃতি = “সংসার প্রবৃত্তির কারণ অবিদ্যা।” প্রকৃতিজাত অর্থে প্রাকৃত। ইহার মধ্যে প্রাকৃত-লোক যোগিলোকের দ্বারা বাধিত হয়। কিন্তু যোগিলোক প্রাকৃতলোকের দ্বারা বাধিত হয় না। কারণ, যোগীদের নিকট উভয়লোকই অনাবৃত থাকে কিন্তু প্রাকৃতেরা যোগিলোকের উপলব্ধি করিতে পারে না। “ন বাধতে জ্ঞানম-তৈমিরাণাং যথোপলব্ধং তিমিরেষ্ণানাং।”

বাধ্যন্তে ধীবিশেষেণ যোগিনোহপ্যুত্তরোত্তরৈঃ।

দৃষ্টান্তেনোভরেষ্টেন কার্যার্থমবিচারতঃ ॥৪

৪। যোগীদের জ্ঞানও উত্তরোত্তর নিম্নল হইতে থাকিলে তাহা পূর্ব পূর্ব যোগিজ্ঞানকে বাধিত (তিরস্কৃত) করিতে থাকে। মায়ামরীচি, গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতির দৃষ্টান্ত যোগী ও প্রাকৃত উভয়ের পক্ষেই সঙ্গত হয়, কারণ যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধৃত হয় সেইরূপ মায়াত্মক হেতুর দ্বারা মায়ী নিবর্ত্তিত হয় সুতরাং যোগী ও প্রাকৃত উভয়েই কার্য-সাধনের জন্য মায়াময় (কার্য-সিদ্ধির) হেতু অবিচারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে উক্ত হয়—“উপারভূতং ব্যবহারসত্যমুপেয়ভূতং পরমার্থ সতাম্।”

লোকেন ভাবা দৃশ্যন্তে কল্পান্তে চাপি তত্ত্বতঃ।

নতু মায়াবদিত্যত্র বিবাদো যোগিলোকয়োঃ ॥ ৫

৫। সাধারণ লোকে ভাব সকলকে গোচর করে এবং তাহারাই যে বস্তুত সং এরূপ কল্পনা করে। পরন্তু তাহারা যে মায়ার মত তাহা লোকে উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহাই যোগীদের ও সাধারণ লোকের মধ্যে বিবাদ (প্রভেদ)।

প্রত্যক্ষমপিরূপাদি প্রসিদ্ধ্যা ন প্রমাণতঃ ।

অশুচ্যাदिषু শুচ্যাदिप्रसिद्धिरिव सा मृषा ॥ ৬

৬ । রূপাদি বিষয় বাহ্য প্রত্যক্ষ হয় তাহারাও প্রামাণিক বা তাত্ত্বিক নহে । অশুচিতে শুচিখ্যাতি, অনিত্যে নিত্যতাখ্যাতি ইত্যাদিবৎ তাহারা (বিষয়জ্ঞান) মিথ্যা । কথিত আছে—“ইন্দ্রিরৈরূপলব্ধং যৎ তত্ত্বেন ভবেত্তদি । জ্ঞাতাস্তত্ত্ববিদো বালাস্তত্ত্বজ্ঞানেন কিং তদা ।”

লোকাবতারণার্থং চ ভাবা নাথেন দেশিতাঃ !

তত্ত্বতঃ ক্ষণিকা নৈতে সংবৃত্যা চেদ্বিরূধ্যতে ॥ ৭

৭ । দৃশ্য পদার্থে অভিনিবিষ্ট লোকদের সূচারুরূপে শূন্যতার অধিগম করাইবার জন্তই নাথ (বুদ্ধদেব) ভাব সকলের বা পঞ্চস্কন্ধ ও দ্বাদশায়তনের বিষয় স্থাপিত করিয়াছেন । পরমার্থত ভাবসকল ক্ষণিক নহে, কারণ যখন ভাব সকল নিঃস্বভাব তখন তাহাদের স্বভাব ক্ষণিকত্ব, একরূপ বলাও বুদ্ধ নহে । আর যদি বল ঐ ক্ষণিকত্ব স্বভাবও সংবৃতি বা অবিচার দ্বারা উপলব্ধ হয়, তাহা সঙ্গত হয় না । কারণ, তাহাদের অক্ষণিকতা সাধারণ সংবৃত্ত অবস্থায় প্রতীত হয়, ইহা যে দোষ নহে তাহা পরের শ্লোকে বিবৃত হইতেছে ।

ন দোষো যোগিসংবৃত্যা লোকাভে তত্ত্বদর্শিনঃ ।

অনুগা লোকবাধাশ্চাদশুচিস্ত্রীনিরূপণে ॥ ৮

৮ । যে সংবৃতির দ্বারা ভাব সকলের ক্ষণিকত্ব প্রতীত হয় তাহা যোগিসংবৃতি (যোগীরাও বুদ্ধির দ্বারা উহার উপলব্ধি করেন আর বুদ্ধিই সংবৃতি) । যোগীরা সাধারণ লোক অপেক্ষা তত্ত্বদর্শী সূতরাং সম্পূর্ণ পরমার্থত না হউক যোগীদের তত্ত্বদৃষ্টিতে ভাবসকল ক্ষণিক । (অর্থাৎ অর্কবাগ্দর্শীরা ভাবসকলকে অক্ষণিক দেখে, তদপেক্ষা তত্ত্বদর্শী যোগীরা ক্ষণিক দেখেন আর পরমার্থসিদ্ধ হইলে অক্ষণিক বা ক্ষণিক কিছুই থাকে না) ।

সাধারণ লোকে স্ত্রী আদিকে শুচি মনে করে কিন্তু তত্বদৃষ্টিতে তাহা সব অশুচি বলিয়া খ্যাত হয়, এ স্থলেও যেমন লোক-প্রতীতির বাধা হয়, ক্ষণিকত্ব বিষয়েও সেইরূপ হয়, অতএব উহাতে দোষ নাই।

পরমার্থত যে সমস্তই স্বপ্নোপম, মায়োপম তাহা প্রজ্ঞাপারমিতার দেব-পুত্রদের স্মৃতি বলিয়াছেন ; যথা—হে দেবপুত্রগণ ! সমস্ত প্রাণীই মায়োপম স্বপ্নোপম। সমস্ত ধম্ম এমন কি সম্যক্ সম্বুদ্ধত্ব এবং নির্বাণও স্বপ্নোপম, মায়োপম।

মায়োপমাজ্জিনাং পুণ্যং সত্ত্বাবেহপি কথং যথা।

যদি মায়োপমঃ সত্ত্বঃ কিং পুনর্জায়তে মৃতঃ ॥৯

৯। যদি শঙ্কা কর যে মায়োপম বুদ্ধ হইতে কিরূপে পুণ্য হইতে পারে, তত্বত্বরে বলি যে মায়োপম না হইলে বুদ্ধ সংস্করূপ হইবেন, তাহা হইলেই বা কিরূপে বুদ্ধ হইতে পুণ্য হইতে পারে ? অর্থাৎ আমাদের মতে পুণ্যও মায়োপম স্মৃতিরং মায়োপম বুদ্ধ হইতে মায়োপম পুণ্য হইবে তাহাতে আর কথা কি ? যাহাদের মতে বুদ্ধ পরমার্থ সং তাহাদের মতে যেমন পরমার্থ সং পুণ্য হয় এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ স্থায়।

আরও শঙ্কা হইতে পারে যে যদি সত্ত্বসকল মায়োপম তবে তাহারা মৃত হইয়া কিরূপে জন্মায় ? উত্তর পরশ্লোকে বলিতেছেন।

যাবৎ প্রত্যয় সামগ্রী তাবন্মায়াপি বর্ততে।

দীর্ঘসন্তানমাত্রেণ কথং সত্ত্বোহস্তি সত্যতঃ ॥১০

১০। যতকাল প্রত্যয় সামগ্রী (মায়ার হেতু) থাকে, তত কাল মায়োপম থাকে। স্মৃতিরং সত্ত্বগণ দীর্ঘকাল থাকিতে পারে। দীর্ঘকাল থাকিলেই যে তাহা পরমার্থ সং হইবে তাহার কোনও নিয়ম নাই।

মায়াপুরুষঘাতাদৌ চিত্তাভাবান্ন পাপকং।

চিত্তমায়া সমেতে তু পাপপুণ্যসমুদ্ভবঃ ॥১১

১১। শঙ্কা হইতে পারে মায়াপুরুষকে বধাদি করিলে যেমন পাপ হয়

না, তেমনি অশ্রু প্রাণীকে বধাদি করিলেও পাপ হওয়া উচিত নহে, কারণ তোমাদের মতে সমস্তই মায়া। এতদ্বারা বক্তব্য এই যে মায়ানিশ্চিত পুরুষের চিত্ত থাকে না বলিয়া তাহার বধাদিতে পাপ হয় না (তবে ষাটকের অসদভিপ্রায়ের জন্য অশ্রু হইতে পারে) কিন্তু চিত্ত-(বিজ্ঞান) রূপ মায়াকৃত সত্ত্বের অপকার বা উপকার করিলেই পাপপুণ্য সমুদ্ভূত হয়।

মন্ত্রাদীনামসামর্থ্যান্ন মায়্যচিত্তসম্ভবঃ ।

সাপি নানাবিধা মায়্য নানা প্রত্যয়সম্ভবা ।

নৈকস্য সৰ্ব্বসামর্থ্যে প্রত্যয়স্যাস্তি কুত্রচিৎ ॥১২

১২। মায়ানিশ্চিত পুরুষের মায়্যচিত্ত হয় না, কারণ মায়্যাবীর মন্ত্রাদির সে বিষয়ে সামর্থ্য নাই। মায়্যও নানাবিধ আছে তাহা নানা কারণ হইতে সমুদ্ভূত হয়। অতএব মায়্য এই নামের একত্ব থাকিলেও একরূপ মায়্যের দ্বারা অন্তরূপ কার্য হয় না। সুতরাং একরূপ মায়্যাকার্য দেখিয়া তাহা সৰ্বত্র সংযোজিত করিতে বাওয়া ঠায়সঙ্গত নহে।

— একই প্রত্যয়ের বা কারণের কুত্রাপি সৰ্ব্বসামর্থ্য দেখা যায় না। সুতরাং যথাযোগ্য প্রত্যয় হেতু হইতে যথাযোগ্য মায়্য উদ্ভূত হয়। অনিয়মে কিছু হয় না।

নিরৃতঃ পরমার্থেন সংবৃত্ত্য যদি সংসরেৎ ।

বুদ্ধোহপি সংসরেদেবং ততঃ কিং বোধিচর্যয়া ॥১৩

১৩। (সৌত্রান্তিকাদি বিরুদ্ধবাদীদের বলি যে উক্ত নিয়ম না থাকিলে অর্থাৎ) পরমার্থত কেহ নিৰ্বাণ পাইলে যদি পুনশ্চ সংসৃত্ত হয় তবে বুদ্ধও সংসৃত্ত হইবেন। অতএব বোধিচর্য্যার ফল কি ?

প্রত্যয়ানামনুচ্ছেদে মায়্যাপ্যচ্ছিদ্যতে ন হি ।

প্রত্যয়ানাং তু বিচ্ছেদাৎ সংবৃত্ত্যাপি ন সম্ভবঃ ॥১৪

১৪। প্রত্যয় সকলের উচ্ছেদ না হইলে মায়্যও উচ্ছিন্ন হয় না, আর প্রত্যয়ের বিচ্ছেদ হইলে সংবৃত্তির দ্বারাও আর মায়্য হয় না (প্রকৃত-

পক্ষে যথাযোগ্য প্রত্যয়ে সংবৃত্তিরই উচ্ছেদ হয় বলিয়া আর সংবৃত্তিকার্য্য থাকে না) । সংবৃত্তির অপর নাম অবিজ্ঞা তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে । অবিজ্ঞার উদাহরণ বৌদ্ধদের সূত্রে এইরূপ আছে, যথা—অবিজ্ঞা কি কি ? —এই যে ছয় ধাতু (শরীর ধাতু) তাহাদের যে এক সংজ্ঞা, পিণ্ড সংজ্ঞা, নিন্দা সংজ্ঞা, ধুব সংজ্ঞা, শাশ্বত সংজ্ঞা, সুখ সংজ্ঞা, আত্ম সংজ্ঞা, সত্বসংজ্ঞা, জীব সংজ্ঞা, জন্তু সংজ্ঞা, মনুজ সংজ্ঞা, মানব সংজ্ঞা, অহঙ্কার সংজ্ঞা, মম-কার সংজ্ঞা ইত্যাদি যে বিবিধ অজ্ঞান তাহাই অবিজ্ঞা । এইরূপ অবিজ্ঞা থাকিলে বিষয়ে রাগ, দ্বেষ, মোহ উদ্ভূত হয় । এই রাগ, দ্বেষ ও মোহই সংস্কার, অতএব সংস্কার অবিজ্ঞা-প্রত্যয় বা অবিজ্ঞাজনিত । সংস্কার-প্রত্যয় বিজ্ঞান । বিজ্ঞান-প্রত্যয় নাম (বিজ্ঞানসহজন্মা চারি সংজ্ঞাদি অরূপ স্বক্ক) ও রূপ (মহাভূত) । নামরূপ-প্রত্যয় ষড়ায়তন বা ছয় ইন্দ্রিয় । ষড়ায়তন-প্রত্যয় স্পর্শ বা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান (মন ও ইন্দ্রিয়) । স্পর্শ-প্রত্যয় বেদনা বা সুখ দুঃখানুভব । বেদনা-প্রত্যয় তৃষ্ণা (বেদনাতে অধ্যবসায়) । তৃষ্ণা-প্রত্যয় উপাদান বা তৃষ্ণার বৈপুল্য । উপাদান-প্রত্যয় ভব বা জন্মহেতু কন্ম । ভব-প্রত্যয় জাতি বা শরীর ধারণ । জাতি-প্রত্যয় জরা, মরণ, শোক পরিদেবন (বিলাপ), দুঃখ, দৌর্গম্য ও উপারাসা ॥ ইহাই বৌদ্ধদের প্রতীত্যসমুৎপাদ । বিপরীত ক্রমে অবিজ্ঞানাশ হইলে দুঃখের প্রহাণ হয় ।

বৌদ্ধেরা বলেন “যথাক্ষেপং ক্রমাদ্ বুদ্ধঃ সন্তানং ক্লেশকন্মভিঃ । পরলোকং পুনর্যাতীত্যানাদি ভবচক্রকং । স প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাদশাঙ্গত্রিকাণ্ডকঃ ॥” অর্থাৎ ক্লেশ ও কন্মের দ্বারা ক্রমশঃ সন্তান (আত্মভাব) বৃদ্ধ হইয়া পর-লোকে পুনশ্চ যায় । এইরূপে ভবচক্র অনাদি । সেই প্রতীত্যসমুৎপাদ দ্বাদশাঙ্গ ও ত্রিকাণ্ড (দ্বাদশ অঙ্গ অবিজ্ঞা সংস্কারাদি । ত্রিকাণ্ড = ক্লেশকাণ্ড কন্মকাণ্ড ও দুঃখকাণ্ড) ।

যদা ন ভ্রান্তিরপ্যস্তি মায়া কেনোপলভ্যতে ॥১৫

১৫ । গ্রন্থকার মাধ্যমিক । মাধ্যমিকেরা মায়াবাদী । বিজ্ঞানবাদী

যোগাচারেরা, বাহ্যিক বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যিক স্বীকার করেন না, তাঁহারা
মায়াবাদের এইরূপ দোষ দেন—

যখন আপনারা (মাধ্যমিকেরা) সমস্ত জগৎকে মায়ায় কল্পিত স্বভাব
শূন্য বলেন তখন মায়াস্বভাব সংসৃতিগ্রাহিকা (অবিজ্ঞা বলিয়া জানা)
বুদ্ধিও আপনাদের মতে থাকিবে না, অতএব মায়া কিসের দ্বারা উপলব্ধ
হইবে ? আমাদের (বিজ্ঞানবাদীদের) মতে তাহা সম্ভব হইতে পারে
কারণ আমাদের বিজ্ঞান পরমার্থ সং আর বাহ্যবস্তুই ভ্রান্তি ।

যদা মায়েব তে নাস্তি তদা কিমুপলভ্যতে ।

চিত্তমৈব স আকারো যদ্যপ্যন্তোহস্তি তদ্ব্যতঃ ॥১৬

১৬ । এতদ্ব্যতরে বিজ্ঞানবাদীদেরকে বলিব্য যে যখন আপনাদের মতে
মায়াই নাই তখন তাহার উপলব্ধির কথা বৃথা । যদিও আপনাদের মতে
বাহ্যবস্তু চিত্তেরই আকার তথাপি তাহা বস্তুতঃ আছে (কারণ হস্তী, অশ্বাদি
বাহ্যবস্তুর জ্ঞাতচিত্ত হইতে বাতিরিক্ত সত্তা স্বীকার করার যো নাই ।)

চিত্তমৈব যদা মায়া তদা কিং কেন দৃশ্যতে ।

উক্তং চ লোকনাথেন চিত্তং চিত্তং ন পশ্যতি ॥১৭

১৭ । পরন্তু যদি চিত্ত বা দর্শন শক্তি মাত্র থাকে এবং দৃশ্য না থাকে
তবে দর্শনই সিদ্ধ হয় না ; সমস্তের অন্ধতা সিদ্ধ হয় । কারণ চিত্তই যখন
মায়া তখন কাহাকে কিসের দ্বারা জানা যাইবে ? যদি বলা চিত্তের স্বসং-
বেদন গুণেই নিজের বাহ্যবস্তুস্বরূপ আকার চিত্ত নিজেই জানে তাহাও
ঠিক নহে, কারণ লোকনাথ বুদ্ধ বলিয়াছেন যে চিত্ত চিত্তকে জানে না ।

ন চিন্তি বগাঅানমসিধারা তথা মনঃ ।

আয়ত্তাবং বথাদীপঃ সম্প্রকাশরতীতি চেৎ ॥১৮

নৈব প্রকাশতে দীপো বস্মান্ন তমসাবৃতঃ ।

নহি স্ফটিকবল্লীলং নীলং ব্রহ্মমপেক্ষতে । ১৯

১৮।১৯ । অসিধারা সেরূপ নিজেই চিন্তা করিতে পারে না মনও সেই-

রূপ নিজেকে জানিতে পারে না। যদি বল প্রদীপ যেরূপ নিজেকে ও
অন্যকে প্রকাশ করে মনও তদ্রূপ স্বপ্রকাশ, তাহাও সঙ্গত হয় না ;
কারণ ঘণ্টাদির জ্বালা দীপ বস্তুত প্রকাশিত হয় না কারণ তাহা পূর্বে
অন্ধকারাবৃত হইয়া থাকে না, তমসাবৃত সংবস্তুর প্রকাশই প্রকাশন। যাহা
পূর্বে তমসাবৃত ভাবে ছিল না তাহার প্রকাশন সম্ভব নহে। স্ফটিক যেরূপ
নীলহাদির জ্বালা অন্তর (নীল পুষ্পাদির) অপেক্ষা করে নীলহ সেরূপ
স্বকীর নীলহের জ্বালা অন্তর অপেক্ষা করে না।

তথা কিঞ্চিপরাপেক্ষমনপেক্ষং চ দৃশ্যতে ।

অনীলত্বে ন তন্নীলং নীলহেতুর্যথেক্ষতে ॥ ২০

২০। এইরূপ কোনবস্তু পরাপেক্ষ প্রকাশযুক্ত এবং কোন বস্তু পরান-
পেক্ষ প্রকাশযুক্ত দেখা যায়। যেমন নীল যদি অনীল হইত তাহা হইলে
নিজেকে নিজে নীল করিতে পারিত না। সুতরাং নীলগুণ পরনিরপেক্ষ।
দীপও সেইরূপ পরনিরপেক্ষ প্রকাশ। চিত্তও সেইরূপ পরনিরপেক্ষ প্রকাশ।
সুতরাং বিজ্ঞানবাদীর চিত্তের আত্মপ্রকাশ করারূপ মত (যাহাতে ক্রিয়া
ও কারকরূপভেদ সূচিত হয়) নিকান্তবাদীদের দ্বারা নিরাকৃত হইল।
মাদামিকদের কৃষ্ণ বুদ্ধি “পরনিরপেক্ষ প্রকাশ” অর্থে নিজেকে নিজে প্রকাশ
নহে, কারণ তাহাতেও কারক ও ক্রিয়া রূপ ভেদ হয়।

। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানবাদী ও মাদামিক ইহাদের উভয় মতের কতকটা
সত্য। বিজ্ঞানের দ্বারা যেরূপ বিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহাই আমাদের জগৎ
ইহা বিজ্ঞানবাদের সত্য সিদ্ধান্ত। কিন্তু কেবল একই বিজ্ঞান হইতে স্বগত
হেতুতেই যে জগতের জ্ঞান হয় ইহা সত্য নহে। কোন এক বিজ্ঞান ব্যতীত
বাহ্য অন্য হেতু থাকিতেই জগৎরূপ মারা দেখা যায় ইহা সমীচীন মত। চিত্তের
স্বসংবেদন বিষয়ে দীপের দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ ঠিক নহে, কারণ দীপ গ্রাহ্য ও
চিত্ত গ্রহণশক্তি। সেইরূপ পরনিরপেক্ষ প্রকাশ বলিয়া নীলগুণাদি গ্রাহ্যের
দৃষ্টান্ত দিয়া চিত্তের স্বসংবেদনহের ব্যাখ্যান করিতে যাওয়াও সঙ্গত নহে।

আমাদের আত্মভাবের মধ্যে সমস্তই নীলাদিগুণের দ্বারা দৃশ্য নহে । দৃশ্য থাকিলে দ্রষ্টাও থাকিবে । চিত্তের উপরিস্থ সেই দ্রষ্টা হইতেই স্বসংবেদন হয় এই সাংখ্যীয় সিদ্ধান্ত ব্যতীত গত্যন্তর নাই ।)

দীপঃ প্রকাশত ইতি জ্ঞাত্বা জ্ঞানেন কথ্যতে ।

বুদ্ধিঃ প্রকাশত ইতি জ্ঞান্বেদং কেন কথ্যতে ॥ ২১

২১ । দীপের ও বুদ্ধির স্বয়ংপ্রকাশত্ব বিষয়ে যে সাদৃশ্য নাই তাহা পুনশ্চ দেখান হইতেছে । দীপ প্রকাশিত হয় । ইহা জানিয়া জ্ঞানের দ্বারা বলা যায় । বুদ্ধি প্রকাশিত হয় ইহা কিসের দ্বারা জানিয়া বলা যায় ?

অর্থাৎ বুদ্ধির স্বসংবেদন নাই কারণ যটের যেমন পৃথক জ্ঞাতা বুদ্ধি আছে, বুদ্ধির সেইরূপ কিছুই নাই । তাহা পূর্ব জ্ঞানের সহিত জানা যায় না ; কারণ, পূর্বজ্ঞান অবিদ্যমান । পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা পূর্বজ্ঞান জানা সম্ভব নহে । কারণ পূর্বজ্ঞান ক্ষণিক স্মরণ্য পরজ্ঞানের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না । সহভাবী জ্ঞানের দ্বারাও হইতে পারে না । কারণ অনুপকার হেতু বা কারণকার্য্য ভাব না থাকাতে তাহা বিষয় হইতে পারে না । স্বয়ংও নহে কারণ তাহা বিপ্রতিপর বা প্রমাণহীন । অতএব উহা কিরূপে হয় তাহা (এই মতে) অজ্ঞেয় । (বলা বাহুল্য মাধ্যমিকদের ব্যাখ্যানের গুণীর ভিতন স্বসংবেদন না পড়িলেও স্বসংবেদন যে আছে তাহা সত্য এবং কেন আছে তাহারও কারণ আছে ।)

প্রকাশা বাপ্রকাশা বা যদা দৃষ্টা ন কেনচিত্ ।

বক্ষ্যাচ্ছিত্ত্বীলেব কথ্যমানাপি সা মুখা ॥ ২২

২২ । বুদ্ধি প্রকাশাত্মিকা বা অপ্রকাশাত্মিকা তাহা কেহ দেখে নাই স্মরণ্য বক্ষ্যাচ্ছিত্ত্বীর নীলার বর্ণনার দ্বারা উহা বলা যুগা ।

যদি নাস্তি স্বসংবিত্তি বিজ্ঞানং স্বর্য্যতে কথং ।

অত্মানুভূতে সংবন্ধাৎ স্মৃতিরাত্মবিসং-যথা ॥ ২৩

২৩ । বিজ্ঞানবাদীরা পুনশ্চ শঙ্কা করেন যে যদি বিজ্ঞানের স্বসংবেদন

না থাকে তবে বিজ্ঞানের স্মরণ হয় কি প্রকারে ? কারণ অননুভূত বিষয়ের স্মরণ হওয়া সম্ভব নহে । বিজ্ঞানকালে যদি বিজ্ঞানের অনুভব না হইত তবে উত্তরকালে সেই বিজ্ঞানের স্মরণ হইত কিরূপে ? অননুভূত বিষয়ের স্মরণ হয় এরূপ বলিলে অতিপ্রসঙ্গদোষ হয় অর্থাৎ স্মরণের কোনও নিয়ম থাকে না ।

এতদ্বারা বক্তব্য এই যে, জ্ঞান হইতে ভিন্ন যে গ্রাহ্য বিষয় তাহা অননুভূত হইলে জ্ঞানের স্মৃতি হয় । একের অনুভবে অণুর (অণু জ্ঞানের) স্মরণ হইতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ হওয়ার শঙ্কাও নাই, কারণ স্মরণ অনিয়মে হয় না, পরন্তু সম্বন্ধ হইতেই হয় । বিজ্ঞান গ্রাহকরূপে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ । পূর্বা অনুভূত বিষয়ের যখন উত্তরকালে অনুস্মরণ হয় তখন অনুভববিশিষ্ট হইয়াই (সম্বন্ধ হেতু) বিষয়ের স্মরণ হয় । সুতরাং স্মরণের অতিপ্রসঙ্গ বা বিপ্লব ঘটে না । সম্বন্ধ হইতে কার্য্য হওয়ার উদাহরণ মূষিকবিষ । মূষিকের বিষ যেমন সম্বন্ধ হইতে কালান্তরে উৎপন্ন হয় স্মৃতিও সেইরূপ । মূষিক বিষ একক্ষণে কোন শরীরে সংক্রান্ত হইলে পর কালান্তরে মেঘগর্জ্জন অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয়, স্মৃতিও সেইরূপ ।

প্রত্যয়ান্তরযুক্তস্য দর্শনাৎ স্বং প্রকাশতে ।

সিদ্ধাঙ্গন বিধেদ'ষ্টৌ ঘটৌ নৈবাঙ্গনং ভবেৎ ॥ ২৪

২৪ । অন্য কারণের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান হইতে চিত্তের স্বং বা নিজত্বের জ্ঞান হয় । অর্থাৎ যেমন কোন কারণ দেখিয়া পরচিত্তের জ্ঞান হয় সেইরূপ স্বচিত্তের আলম্বনাদি দেখিয়া স্বচিত্তের জ্ঞান হয় । (বিজ্ঞানবাদীরা এইরূপ বলিলে আমরা বলিব যে) সিদ্ধাঙ্গন বিধিতে ঘট (নিধি) দেখিলে যেমন সেই ঘট সিদ্ধাঙ্গন হয় না সেইরূপ যে সব কারণে স্বচিত্তের জ্ঞান হয় তাহাও স্বচিত্ত হয় না ।

(বলা বাহুল্য স্বসংকেদন, যাহাকে Mill এক paradox বলিয়াছেন, কেন হয় তাহা মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদীদের theoryর দ্বারা বুঝিবার

সম্ভাবনা নাই। স্বপ্রকাশরূপ এক পদার্থ ব্যতীত উহা বুঝার উপায় নাই ;
 (ই স্বপ্রকাশ পদার্থ দৃশ্য পদার্থের অতীত) ।

যথা দৃষ্টং শ্রুতং জ্ঞাতং নৈবেহ প্রতিষিধ্যতে ।

সত্যতঃ কল্পনা তত্র ছঃখহেতু নিবার্যতে ॥২৫

২৫। শক্তি হইতে পারে যে জ্ঞান যদি (সিদ্ধাঙ্গনের বা ঘটের ঞ্চার)
 অবিদিত স্বরূপ হয় তবে কোন জ্ঞেয়ই প্রকাশিত হইবে না। দৃষ্ট, শ্রুত,
 জ্ঞাত ইত্যাদি ব্যবহার লোকে থাকিত না যদি চিত্ত অবাক্তস্বভাব হইত।

ইহাতে বক্তব্য এই “দৃষ্টশ্রুতাদি ব্যবহার হইত না” যে বলা হয় তাহা
 পরমার্থত কি সংবৃত্তিত ? যদি পরমার্থত নাই বল তবে তাহা আমাদেরও
 (মাধ্যমিকদেরও) অভিমত কারণ সংবৃত্তের পরমার্থ চিন্তায় অবতার নাই
 (আসে না) । আর যদি বল যে লোকপ্রসিদ্ধিতে ইরূপ ব্যবহার হয় তাহাও
 আমাদের অভিমত । কারণ, দৃষ্ট-শ্রুত-জ্ঞাত বাহ্য বেকরূপ হয় তাহার আমরা
 প্রতিবেদ করি না। উহারা যে সত্য বা পারমার্থিক এরূপ কল্পনাই আমরা
 প্রতিবেদ করি। কারণ তাহা ছঃখের হেতু !

(স্বসংবেদন যে আছে বিজ্ঞানবাদীদের এই মত সত্য, কিন্তু তাহা যে
 স্বপ্রকাশ নহে ও দৃশ্য, মাধ্যমিকদের এই মতও সত্য। কিন্তু স্বসংবেদনরূপ
 সংবৃত্তি কিরূপে হয় তাহা কেহ বুঝান না। সংবৃত্তি বা অবিদ্যামূলক জ্ঞান
 “এককে অত্র জানা” তাহা গ্রন্থকারও বলিয়াছেন। সুতরাং সংবৃত্তির জন্য
 ছই পদার্থ থাকা চাই। স্বসংবেদন সংবৃত্ত হইলে উহা স্বপ্রকাশ পদার্থের
 উপর প্রকাশ্য পদার্থের আরোপ হইবে অথবা প্রকাশ্য বুদ্ধির উপর
 স্বপ্রকাশ পদার্থের আরোপ হইবে। সুতরাং স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা ও প্রকাশ্য
 দৃশ্য এই দুই পদার্থ ব্যতীত স্বসংবেদন বুঝার গত্যন্তর নাই।)

চিত্তাদত্যা ন মায়া চেলাপানচেতি কল্প্যতে ।

বস্তু চেৎ সা কথং নান্যাংনত্যা চেলাস্তি বস্তুতঃ ॥২৬

২৬। প্রাসঙ্গিক কথা সমাপন করিয়া পুনশ্চ প্রকৃত বিনয় বলিতেছেন।

মায়া যদি চিত্ত হইতে অন্ত না হয় তবে তাহাকে চিত্ত হইতে অনন্ত করিয়া
করিতে হইবে। যদি মায়া বস্তু হয় তবে তাহা চিত্ত হইতে অন্ত হইবে না
কেন ? আর যদি তাহা চিত্ত হইতে অনন্ত হয় তবে তাহা বস্তুত নাই।

অসত্যপি যথা মায়া দৃশ্যা দ্রষ্টৃ তথা মনঃ।

বস্তুশ্রয়শ্চৎ সংসারঃ সৌহৃদ্যথাকাশবদ্ববেৎ ॥২৭

২৭। মায়া অসতী হইলেও যেমন তাহা দৃশ্য হয়, মনও সেইরূপ
পরমার্থত অসৎ-স্বভাব হইলেও দ্রষ্টা বা দর্শনসমর্থ হয় (ইহাতে ৯।১৫
শ্লোকোক্ত শঙ্কা নিরাসিত হইল। অর্থাৎ যদি ভ্রান্তিই না থাকে—মায়া
বলিয়া—তবে মায়া কিসের দ্বারা উপলব্ধ হয় এই শঙ্কা)। পরমত লক্ষ্য
করিয়া পুনশ্চ বলিতেছেন সংসারকে যদি চিত্তরূপ বস্তুর আশ্রিত পদার্থ বল
তবে তাহা চিত্তভিন্ন—সুতরাং অবস্তু হইবে (কারণ বিজ্ঞানবাদে চিত্তই
একমাত্র বস্তু)। যেমন আকাশ বায়ুত্রয় সং, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অসৎ,
সুতরাং অর্থক্রিয়াকারিত্ব-হীন পদার্থ, সংসারও সেইরূপ হইবে।

বস্তুশ্রয়েণাভাবশ্চ ক্রিয়াবদ্বৎ কথং ভবেৎ।

অসৎ সহায়মেকং হি চিত্তমাপদাতে তব ॥২৮

২৮। যদি বল সংসার অবস্তু হইলেও চিত্তরূপ বস্তুর আশ্রিত বলিয়া
তাহার অর্থ-ক্রিয়াসামর্থ্য হইবে—ইহাও যুক্ত নহে ; কারণ বস্তুর আশ্রয়ের
দ্বারা অভাবের বিরূপ ক্রিয়াবত্তা সিদ্ধ হইতে পারে (শক্তিই ভাব, আর
সর্বশক্তির বিরহ = অভাব)।

গ্রাহমুক্তং যদা চিত্তং তদা সর্বৈ তথাগতাঃ।

এবং চ কো গুণো লক্ষশ্চিত্তমাত্রেহপি কল্পিতে ॥২৯

২৯। চিত্ত গ্রাহগ্রাহকআদি আকার-বিনিমুক্ত অদ্বয় লক্ষণ। কথিত হয়
যে এইরূপ চিত্তের একত্বপ্রতিপাদনে আমাদের কোন ক্ষতি হয় না। তাহা
সত্য নহে, কারণ সংক্লেশ-(রাগাদি মল) রূপ গ্রহেয় চিত্তাংশ থাকাতে
চিত্ত এক বিরূপে হয় ? আর যদি গ্রাহগ্রাহক নিমুক্ত অদ্বয় স্বভাব চিত্ত—

এরূপ বল তবে সেই চিত্ত সর্বগত হওয়াতে সমস্ত সত্ত্বেরাই তথাগত বা বুদ্ধ হইত। সর্বগত অদ্বয়স্বভাব চিত্তমাত্র বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রকল্পনা করিয়াই বা কি সুবিধা হয়? সর্ব প্রাণীতে সংক্লেশ ত বর্তমান আছেই ইহার প্রহাণ না করিলে নির্বাণ হয় না, সুতরাং সর্বগত চিত্তমাত্রকল্পনার লাভ কি? (এই “অদ্বয়স্বভাব বিজ্ঞপ্তিমাত্র” আর্ষদের “চৈতন্যের” অনুরূপ। বৌদ্ধদের সম্প্রদায়বিশেষ চৈতন্যপদার্থও যে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ইহা হইতে জানা যায়। এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় আত্মবাদীও ছিল)।

মায়োপমত্বেহপি জ্ঞাতে কথং ক্লেশো নিবর্ততে।

যদা মায়াক্রিয়াং রাগস্তৎকর্তুরপি জায়তে ॥ ৩০

৩০। অদ্বয়স্বভাব চিত্তকল্পনার কোন লাভ নাই এরূপ যদি বলা যায় তবে সেই বাদীরা বলিতে পারেন যে জগতের মায়োপমত্ব জানিয়াই বা কিরূপে ক্লেশের নিবৃত্তি হয়। কারণ দেখা যায় যে মায়ানিশ্চিত স্ত্রী আদিতেও নাগাদি উৎপন্ন হয়। শুদ্ধ যে মায়ার দর্শকদের রাগাদি উৎপন্ন হয় এরূপ নহে পরন্তু যে মায়ী দেখায় তাহারও তাহাতে রাগাদি উৎপন্ন হয়।

অপ্রহীণা হি স্তৎকর্তুর্জ্ঞেয়সংক্লেশ বাসনা।

তদ্দৃষ্টি কালে তস্মাতো দুর্বলা শূন্যবাসনা ॥ ৩১

৩১। মায়াবীর মায়াক্রীতে রাগ উৎপন্ন হওয়ার কারণ আছে তাই হয়। তাহার সংক্লেশ বাসনা অপ্রহীণ থাকা এবং শূন্যবাসনা দুর্বল থাকাই সেই কারণ। ইহা পূর্বোক্ত শঙ্কার উত্তর।

শূন্যতা-বাসনাধানাক্রীয়তে ভাববাসনা।

কিংচিনাস্তীতি চাভ্যাসাৎ সাপি পশ্চাৎ প্রহীয়তে ॥ ৩২

৩২। শূন্যতাবাসনা (সমস্ত মায়াস্বভাব ও নিঃস্বভাব এরূপ জ্ঞানের সংস্কার) আহিত হইলে ভাববাসনা নষ্ট হয়। তৎপরে কিছু নাই এরূপ ভাবের অভ্যাসের দ্বারা শূন্যবাসনাও নষ্ট হয়।

যদা ন লভ্যতে ভাবো যো নাস্তীতি প্রকল্প্যতে ।

তদা নিরাশ্রয়োহ্ভাবঃ কথং তিষ্ঠেন্মতেঃ পুরঃ ॥ ৩৩

৩৩ । কিরূপে শূন্যবাসনা নষ্ট হয় তাহা বলিতেছেন—যে ভাবপদার্থ নাই বলিয়া প্রকল্পিত হয় (শূন্যতা ধ্যানকালে) তাহা (ভাবপদার্থ) যখন উপলব্ধ না হয় তখন নিরাশ্রয় অভাব কিরূপে বুদ্ধির অগ্রে থাকিবে ?

এই শূন্যতা যে অত্যন্তাভাব নহে তাহা দ্রষ্টব্য । কিছু নাই (যথা রূপশূন্য, বেদনাশূন্য ইত্যাদি) এরূপ মনোভাব বিশেষই এই শূন্যতা বা শূন্যতাবুদ্ধি । ফলত ইহা পারিভাষিক শূন্যতা ; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ইহা মনোভাববিশেষ । আষ' দার্শনিকেরা উহাকে ভাবপদার্থ (ধ্যেয়) বলিয়া সংশ্লিষ্ট করাতে গোল হয় না । বৌদ্ধ শাস্ত্রে উহার অভাববাচক সংজ্ঞা থাকাতে অনেক গোল হয় । কোন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় শূন্যতাকে অভাব কল্পনা করিয়া ন্যায়সঙ্গত ভাস্যার দার্শনিক সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হন না । মাধ্যমিকেরা বলেন শূন্যতা মনসিকার বিশেষ । ভাবাভিনিবেশের প্রহাণের জন্য সর্বধর্মশূন্যতা উপাদেয় (গ্রাহ) । শূন্যতাভিমুখতা সিদ্ধ হইলে সেই শূন্যতাও ত্যাজ্য । তাহাতে যে ভাবকল্পনা থাকে তাহাও তৎপরবর্তী বিচারের দ্বারা নিবর্তিত হয় । অতএব শূন্যতা ভাবনাও ভাবকল্পনা । প্রাচীনতর যোগশাস্ত্রমতে পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে অন্তমুখ করিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিলে বিষয়াভাবে চিত্ত নিরুদ্ধ হয় । বৌদ্ধেরা ইহাই ভিন্ন (কিন্তু অসঙ্গত) ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করেন ।

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সংতিষ্ঠতে পুরঃ ।

তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বা প্রশাম্যতি ॥ ৩৪

৩৪ । যখন ভাব বা অভাব বুদ্ধির অগ্রে থাকে না তখন অন্য গতির অভাবে বুদ্ধি নিরালম্বা হইয়া প্রশমিত বা নিবৃত্ত বা নিরুদ্ধ হয় । (ইহা এবিষয়ে সার কথা । ভাব অর্থে রূপাদি ব্ধক । অভাব অর্থে 'উহারা

নাই” এরূপ মনসিকার। তাহাতে বিষয়গ্রহণ রুদ্ধ হয় কিন্তু ভাবের যে অভাব হয় না তাই দ্রষ্টব্য। ইহাই যুক্ততম সাংখ্যমত।)

চিন্তামণিঃ কল্পতরুর্যথেচ্ছা পরিপূরণঃ ।

বিনের প্রণিধানাত্যাং জিনবিশ্বং তথেক্ষ্যতে ॥ ৩৫

৩৫। চিন্তামণি (চিন্তিত ফলদাতা রত্ন) ও কল্পতরু যেমন ইচ্ছার পূর্ণতাকারক সেইরূপ জিনদের মূর্তিও বিনের (শিষ্যত্ব) ও প্রণিধির (বোধিসত্ত্বাবস্থায় প্রাণীদের হিতসংকল্পের) বশে সত্ত্বদের সর্ব কামনার নিষ্পাদন করিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত সংকল্পহীন শূন্যতাভাবনায় জিনদের চিত্ত সমাহিত থাকিলে কিরূপে তাঁহাদের দ্বারা অভীষ্টলাভ হয় তাহার উত্তর দেওয়া হইল।

যথা গারুড়িকঃ স্তম্ভং সাধয়িত্বা বিনশ্রুতি ।

স তস্মিন্শিচর নষ্টেহপি বিষাদীল্পপশাময়েৎ ॥ ৩৬

বোধিচর্য্যানুরূপোণ জিনস্তম্ভোহপি সাধিতঃ ।

করোতি সর্বকাম্যাণি বোধিসত্ত্বেহপি নিবৃত্তে ॥ ৩৭

৩৬-৩৭। যেমন কোন গারুড়িক বা বিষবৈদ্য মন্ত্রাভিসংস্কৃত করিয়া এক স্তম্ভ স্থাপন করিয়া যায় এবং পরে সে উপরত বা মৃত হইলেও দীর্ঘকাল সেই স্তম্ভ বিষাদির উপশান্তি করিতে থাকে সেইরূপ বোধিসত্ত্বেয়া বোধিচর্য্যারূপ মন্ত্র সাধনের দ্বারা জিনরূপ স্তম্ভ (জিনেরাও কর্মহীনত্ব হেতু নির্জীব স্তম্ভের স্থায়) স্থাপিত করেন ; তাহাতে সেই বোধিসত্ত্বেয়া নিবৃত্ত হইলেও সেই জিনস্তম্ভ সর্বকাম্যা (সংস্কৃতি বিষোপশম) সাধন করে।

অচিত্তকে রুতা পূজা কথং ফলবতী ভবেৎ ।

তুল্যৈব পদ্যতে বস্মান্তিষ্ঠতো নিবৃত্তশ্চ চ ॥ ৩৮

৩৮। অচিত্তক বুদ্ধকে পূজা করিলে কিরূপে সেই পূজা ফলবতী হয় ? কারণ শাস্ত্রে জীবিত ও পরিনিবৃত্ত (মৃত) উভয়রূপ বুদ্ধকে পূজা করিলে তুল্যফল হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পুণ্য দ্বিবিধ ত্যাগান্নয় ও পরিভোগান্নয় । দাতার ত্যাগজনিত পুণ্য হয় আর দত্তদ্রব্য বৃদ্ধাদিরা পরিভোগ করিলে তজ্জনিত পুণ্যও হয় । সুতরাং পরিনিবৃত্ত বুদ্ধের উদ্দেশ্যে দান করিলে ত্যাগান্নয় পুণ্য অবশ্যই হইবে ।

আগমাচ্চ ফলং তত্র সংবৃত্ত্যা তত্ত্বতোহপি বা ।

সত্যাবুদ্ধে কৃত্য পূজা সফলেতি কথং যথা ॥৩৯

৩৯ । ভগবানের পূজাতে যে ফল হয় তাহা সংবৃত্তিত ও পরমার্থত উভয় প্রকারেই হয় এবং তাহা আগম হইতে জানা যায় । পরমার্থসং বুদ্ধের পূজা করিলে সফল হয় অতএব স্থিত (জীবিত) বা পরিনিবৃত্ত (মৃত) ভগবান্ যেরূপ হউন না কেন তাহার পূজাতে কাহারও সংবৃত্ত ফল কাহারও বা পারমার্থিক ফল হয় । আগমে আছে যে “তিষ্ঠন্তুং পূজয়েচ্ছন্তু বশ্চাপি পরিনিবৃত্তং । সমচিত্ত প্রসাদেন নাস্তি পুণ্য বিশেষতা ॥”

সত্যদর্শনতো মুক্তিঃ শূন্যতাদর্শনেন কিং ।

ন বিনানেন মার্গেণ বোধিরিত্যাগমো যতঃ ॥৪০

৪০ । বৈভাষিকেরা শূন্যতাবাসনা ধ্যানের দ্বারা সর্বাবরণের প্রহাণ হয় এরূপ স্বীকার করেন না । তাহারা বলেন যে চারিটা আৰ্য্য সত্য (দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখমুক্তি ও দুঃখমুক্তির পথ এই চারি আৰ্য্য সত্য) ভাবনা করিলেই মুক্তি হয় । শূন্যতা দর্শন করিয়া কি হয় ? এতদ্বত্তরে বলি যে শূন্যতা ভাবনারূপ ঐ মার্গ ব্যতীত যে বোধি উৎপন্ন হয় না তাহা আগম বলেন । প্রজ্ঞা-পারমিতাদি মহাযান শাস্ত্রে শূন্যতা ভাবনার সবিশেষ উপদেশ আছে । আর সেই প্রজ্ঞাপারমিতাই মোক্ষমার্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা—বুদ্ধৈঃ প্রত্যেকবুদ্ধৈশ্চ শ্রাবকৈশ্চ নিষেবিতা । মার্গস্বমেকা মোক্ষশ্চ নাস্ত্যান্য ইতি নিশ্চয়ঃ ।

নন্যসিদ্ধং মহাযানং কথং সিদ্ধস্তদাগমঃ ।

যস্মাদ্ভয় সিদ্ধোহসৌ ন সিদ্ধোহসৌ তবাদিতঃ ৪১

৪১ । ইহাতে বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে মহাযানই অসিদ্ধ, অতএব

আপনারা যে আগমকে প্রমাণ দেন তাহাও সিদ্ধ নহে । কেন সিদ্ধ নহে, মহাযানেরা এই প্রশ্ন করিলে প্রতিবাদীরা বলেন বা বলিবেন যে আমাদের আগম যখন আমাদের ও মহাযানদের উভয়ের নিকট বুদ্ধ-বচন বলিয়া সিদ্ধ, তখন আমাদের আগমই সিদ্ধ । মহাযানে আমাদের আস্থা নাই, সুতরাং তাহা উভয়ত সিদ্ধ আগম নহে । তদুত্তরে আমরা বলি যে যদি উভয়ত সিদ্ধতাই আগমের সত্যতার লক্ষণ হয় তবে আদিতে যখন 'উভয়' ছিল না তখন তোমাদের আগম কিরূপে যথার্থাগম হইয়াছিল ?

যৎপ্রত্যয়া চ তত্রাস্থা মহাযানেহপি তাং কুরু ।

অন্তোভয়েষ্টে সত্যত্বে বেদাদেৱপি সত্যতা ॥ ৪২

৪২ । যন্নিবন্ধন নিজের আগমে আস্থা মহাযানেও তাদৃশ আস্থা কর্তব্য । অস্বদুভয়ের বাহ্য ইষ্ট নহে তাহাই যদি সত্য হয় তবে বেদাদিরও সত্যতা হইবে ।

সবিবাদং মহাযানমিতি চেদাগমং ত্যজ ।

তীর্থিকৈঃ সবিবাদত্বাং স্বৈঃ পরৈশ্চাগমাস্তুরং ॥ ৪৩

৪৩ । যদি বল যে আমার আগম যে বুদ্ধ-বচন তদ্বিবরে বিবাদ নাই, কিন্তু মহাযান সেরূপ নহে । এতদুত্তরে বলিব্য এই যে মহাযান সবিবাদ বলিয়া ত্যাজ্য হইলে তোমার নিজের আগমও ত্যাগ কর । কারণ তীর্থিকদের (অন্যান্য দার্শনিকদের) এমন কি স্বসম্প্রদায়স্থদের নিকটও তোমার আগম সবিবাদ বলিয়া শুদ্ধ মহাযান কেন, অন্য সব আগমই ত্যাগ কর ।

শাসনং ভিক্ষুতামূলং ভিক্ষুতৈব চ দুঃস্থিতা ।

সাবলম্বনচিত্তানাং নিক্কাণমপি দুঃস্থিতং ॥ ৪৪

৪৪ । যোগীরা বলেন "সত্যদর্শনতোমুক্তিঃ শৃঙ্খতা দর্শনেন কিং" তাঁহাদের মত খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—ভগবানের শাসনের (বিধিনিষেধের দেশনার) মূল যে ভিক্ষুতা তাহা সাবলম্বন চিত্তদের হয় না । পরন্তু সাবলম্বনচিত্ত-

ব্যক্তিদের পক্ষে নির্বাণও দুইটি অতএব অবলম্বনহীন শূন্যতা দর্শনই মুক্তির হেতু ।

ক্লেশ প্রহাণান্নুক্তিশ্চেতদনন্তরমস্তু সা ।

দৃষ্টং চ তেবু সামর্থ্যং নিঃক্লেশস্তাপি কর্মণঃ ॥ ৪৫

৪৫ । আর্ষ্য সত্যদর্শন হইতে ক্লেশ প্রহাণ, ক্লেশ প্রহাণের পর মুক্তি, এরূপ মত যুক্ত হয় না, কারণ প্রহীণক্লেশ ব্যক্তিদেরকে অক্লিষ্টকর্মের ফল-ভোগ করিতে হয় । উদাহরণ যথা মৌদগল্যায়ন । তিনি অর্হং হইলেও পূর্ব কর্মের ফলে মারিত হইয়াছিলেন ।

তৃষ্ণা তাবদুপাদানং নাস্তি চেৎ সংপ্রধার্যতে ।

কিমক্লিষ্টাপি তৃষ্ণাং নাস্তি সংমোহবৎসতী ॥ ৪৬

৪৬ । যদি বল আর্ষ্যসত্যদর্শন হইতে অবিঘ্নাদির নাশ হয়, তন্নাশে সংস্কার নষ্ট হয়, সংস্কার নাশে তৃষ্ণা নষ্ট হয় ; তৃষ্ণাই পুনর্ভবের কারণ সুতরাং তৃষ্ণা না থাকিলে পুনর্জন্ম হইতে পারে না । অতএব আর্ষ্য সত্যদর্শনই মুক্তির কারণ শূন্যতা দর্শন মোক্ষ কারণ নহে । এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই—যদি বল তাদৃশ মুক্ত পুরুষের পুনর্ভবের উপাদানভূতা তৃষ্ণা নাই, তাহাও ঠিক হয় না । কারণ সাবলম্বনচিত্ত ব্যক্তিদের তৃষ্ণাভাব ঘটা সম্ভব নহে । জিজ্ঞাসা করি আপনাদের ঐ মুক্তপুরুষের অক্লিষ্টীভূত অজ্ঞা-নের (সংমোহের) গ্নায় অক্লিষ্টা তৃষ্ণাও কি নাই ?

বেদনা-প্রত্যয়া তৃষ্ণা বেদনৈষাং চ বিঘ্নতে ।

সালম্বনেন চিত্তেন স্থাতব্যাং যত্র তত্র বা ॥ ৪৭

৪৭ । তৃষ্ণা বেদনাসম্ভবা আর উক্ত যোগীদের বেদনা বর্তমান থাকে সুতরাং তৃষ্ণাও থাকে । যদি বল নিরবিঘ্ন ব্যক্তির বেদনা হইলেও তৃষ্ণা হয় না কিঞ্চি ভাবাভিনিবিষ্টদের নিরবিঘ্নত্বও অসিদ্ধ নহে—তথাপি গ্নায়বলে শূন্যতাদ্যান বিহীন ব্যক্তিতে তৃষ্ণার সম্ভাব সিদ্ধ হয় ।

যখন মুক্ত সম্তানেও (মুক্তচিত্তবৃত্তি প্রবাহেও) কর্মের ফলদানে সামর্থ্য

দেখা যায়, এবং বেদনা থাকিলে যখন তৃষ্ণাও থাকে, তখন সালঙ্ঘন চিত্তদের ক্লেশপ্রহাণ হওয়া সন্দেহস্থল স্মৃতরাং বিমুক্তিও অনিশ্চিত ।

শূন্যতাদর্শন-হীনদেরকে সালঙ্ঘনচিত্তে যে-কোন বিষয়ে অবস্থান করিতে হয় । আর্ষ্যসত্য এবং তাহার ভাবনাফল আদি আলঙ্ঘনে আসঙ্গ থাকাতে নিক্কাণ লাভ তাঁহাদের পক্ষে সন্দেহ স্থল হইয়া দাঁড়ায় ।

বিনা শূন্যতয়া চিত্তং বদ্ধমুৎপত্ততে পুনঃ ।

যথাসংজ্ঞি সমাপত্তৌ ভাবয়েত্তেন শূন্যতাং ॥ ৪৮ *

৪৮ । অতএব শূন্যতা বিনা চিত্ত বদ্ধ থাকে, স্মৃতরাং পুনশ্চ উৎপন্ন হয়; যেমন অসংজ্ঞি সমাপত্তিতে চিত্ত দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ থাকিয়াও পুনঃ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ । অতএব শূন্যতাকে ভাবনা করিবে ।

সক্তিত্রাসান্তু নিস্কৃত্যা সংসারে সিধ্যতি স্থিতিঃ ।

মোহেন দুঃখিনামর্থে শূন্যতয়া ইদং কলং ॥ ৪৯

৪৯ । আসক্তিস্থান ও ভয়স্থান (শাস্বতদৃষ্টি ও উচ্ছেদ দৃষ্টি) পরিত্যাগ করিয়া, দুঃখী প্রাণীদের কল্যাণার্থ অবিজ্ঞা আশ্রয় করিয়া সংসারে স্থিতি হয়—ইহাই শূন্যতার কল ।

* নিম্নস্থ শ্লোকত্রয় এই স্থানে প্রক্ষিপ্ত দৃষ্ট হয় । ইহারা ৯।৪২ শ্লোকের পর থাকিলে অপ্রাসঙ্গিক হইত না । "টীকাকার ইহাদের প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে কয়েকটা হেতুও দিয়াছেন ।

যৎসূত্রেন বতরেদ্বাক্যং তচ্চেদ্বুদ্ধোক্তমিষ্যতে ।

মহাযানং ভবং সূত্রৈঃ প্রায়স্তল্যং ন কিং মতং ॥ ১

একেনাগম্যমানেন সকলং যদি দোষবৎ ।

একেন সূত্রতুল্যেন কিং ন সর্বং জিনোদিতং ॥ ২

মহাকাশপমুখ্যৈশ্চ যদ্বাক্যং নাবগাহতে ।

তত্ত্বয়ানববুদ্ধত্বাদগ্রাহং কঃ করিষ্যতি ॥ ৩

অর্থাৎ দুঃখী প্রাণীদের প্রতি কারুণ্যবশে সংসারে থাকিলেও শূন্যতা ভাবনার দ্বারা সংসারদোষে লিপ্ত হইতে হয় না ।

তদেবং শূন্যতাপক্ষে দূষণং নোপপদ্যতে ।

তন্মান্নিবিচিকিৎসেন ভাবনীয়েব শূন্যতা ॥ ৫০

৫০ । এইরূপে শূন্যতাপক্ষে দূষণ ঘটে না । অতএব সংশয় রহিত-
চিত্তে শূন্যতা ভাবনা করা কর্তব্য ।

ক্লেশজ্ঞেয়াবৃত্তিতমঃ প্রতিপক্ষো হি শূন্যতা ।

শীঘ্রং সর্বজ্ঞতাকামো ন ভাবয়তি তাং কথং ॥ ৫১

৫১ । ক্লেশরূপ ও জ্ঞেয় বিষয়রূপ যে আবরণ সেই আবরণরূপ
তমর বা অজ্ঞানের শূন্যতাই হচ্ছে প্রতিপক্ষ । যাহারা শীঘ্র সর্বজ্ঞতা লাভে
ইচ্ছু তাঁহারা কেন শূন্যতা ভাবনা করেন না ?

যদুঃখজননং বস্তু ত্রাসস্তস্মাৎ প্রজায়তাং ।

শূন্যতা দুঃখশমনী ততঃ কিং জায়তে ভয়ং ॥ ৫২

৫২ । যে বস্তু দুঃখের জনক তাহাই ভয়জনক হয় । শূন্যতা দুঃখ-
শান্তিকারী অতএব তাহাতে ভয় কোথায় ?

যতস্ততো বাস্তু ভয়ং যদুহং নাম কিংচন ।

অহমেব ন কিং চিচ্ছেদ্যং কস্ম ভবিষ্যতি ॥ ৫৩

৫৩ । যদি 'আমি' বলিয়া কিছু থাকে তবেই ভয় (যেভাবে আগত
হউক না কেন) হইতে পারে । 'আমি' যখন 'কিছু নহে' হইয়া যায় তখন
কাহার ভয় হইবে ?

দস্তকেশনখা নাহং নাস্তি নাপ্যস্মি শোণিতং ।

ন শিংঘানং ন চ শ্লেষ্মা ন পূয়ং লসিকাপি বা ॥ ৫৪

৫৪ । দস্ত, নখ, কেশ, অস্তি, শোণিত, শিংঘান (শিকনী), শ্লেষ্মা,
পূয় ও লসিকা ইহার কিছুই আমি নহি ।

নাহং বসা ন চ স্বেদো ন মেদোহস্ত্রাণি নাপ্যহং ।

ন চাহমন্ত্রনিগুণ্ডী গৃধমূত্রমহং ন চ ॥ ৫৫

৫৫ । বসা, স্বেদ, মেদ, অস্ত্র, অস্ত্রনিগুণ্ডী (সূক্ষ্ম অস্ত্রস্থ নাড়ী),
বিষ্ঠা বা মূত্র ইহার কিছুই আমি নহি ।

নাহং মাংসং ন চ স্নায়ু নোন্ম্যবায়ুরহং ন চ ।

ন চ ছিদ্ৰাণ্যহং নাপি ষড়্‌বিজ্ঞানানি সৰ্ব্বথা ॥ ৫৬

৫৬ । মাংস, স্নায়ু, উন্ম্যা, বায়ু, ছিদ্ৰ (দেহগত) ও ছয় বিজ্ঞানও
(চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন হইতে জাত বিজ্ঞান) সৰ্ব্বথা
আমি নহি ।

এইরূপে অহং প্রত্যয় নির্বিষয় দেখা যায় । অতএব অহংপ্রত্যয়
মূলহীন শূন্য । ইহাই শূন্যাত্মবাদের যুক্তি । বলা বাহুল্য এই যুক্তি
সদোষ । শরীর যে প্রকৃত অহং পদার্থ নহে তাহা প্রায়ঃ সৰ্ব্ববাদীরাই
বলেন । শকাদি বিজ্ঞানও যে অহং নহে তাহাও সত্য । কিন্তু তাহা ছাড়া
আত্মবিজ্ঞানও আছে । সেই আত্মবিজ্ঞানই অহং । অহং-প্রত্যয়ের অতি-
রিক্ত এক আত্মভাব থাকাতাই সেই আত্মবিজ্ঞান হইতে পারে । নচেৎ
একস্বরূপ আত্মবিজ্ঞান ('আমি জ্ঞাতা' এতদ্রূপ) হয় কিরূপে ? শরীরাদি
যখন স্পষ্টতই অহং নহে এবং তাহার যখন বহু, তখন অবিভাজ্য একস্বরূপ
অহম্বোধ হয় কেন, বোধের তাহার উত্তর দিতে পারেন না । যদি বলা
যায় যে উহা ভ্রান্তি তাহাতেও বুদ্ধবাদ নষ্ট হয় । কারণ ভ্রান্তি = এক
পদার্থে অন্যের আরোপ । তাহা ছাড়া কোন ভ্রান্তি নাই । আত্মস্থলে
কিসের উপর কিসের আরোপ হইবে ? অবশ্যই বলিতে হইবে অনাত্মার
উপর আত্মার আরোপ বা আত্মার উপর অনাত্মার আরোপ । সুতরাং
আত্মা ও অনাত্মা নামক দুই সত্তার স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর নাই । তন্মধ্যে
অনাত্মভাব = শরীরাদি জড় বিকারশীল দৃশ্যভাব । প্রকৃত আত্মভাব সুতরাং

প্রকৃত প্রস্তাবে উহার বিপরীত বা নির্বিকার চিত্তপ দ্রষ্টৃভাব। ইহাই নিগুণ আত্মবাদীদের সিদ্ধান্ত।

টীকাকার এস্থলে নৈয়ায়িক আদি অনেক দার্শনিকদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ও গ্রন্থকারের উক্তির দ্বারা তাহা খণ্ডন করার প্রয়াস পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য পরের মত যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা প্রায়ই প্রকৃত নহে। সাংখ্য সম্বন্ধে টীকাকার এইরূপ বলিয়াছেন—কাপিলেরা নিত্য, ব্যাপক, নিগুণ, স্বচৈতন্যাত্মক, অকর্তা, ভোক্তা আত্মা স্বীকার করেন। প্রকৃতিই কত্রী ও ফলনেত্রী! বিপর্যাসেই পুরুষে কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয়। ইহা মন্দ কথা নহে; কিন্তু পরে বলিয়াছেন যে—“যখন পুরুষের শব্দাদি বিষয়ভোগের ঔৎসুক্য হয় তখন প্রকৃতি তাহা জানিয়া পুরুষের সহিত সংযুক্তা হয় ও তদনন্তর শব্দাদি সর্গ করে” ইত্যাদি। অমনা পুরুষের ঔৎসুক্য এবং জড়া প্রকৃতির তাহা জানা যে সাংখ্যমত নহে পরন্তু তাহা যে আলোক-অন্ধকারের গ্ৰায় বিরুদ্ধ, তাহা বলা বাহুল্য।

বৌদ্ধদের ধারণা এই—ছয় বিজ্ঞান যে আত্মা নহে তাহা সহন করিতে না পারিয়া সাংখ্যাদিরা বলেন যে আমরা শব্দাদি বিজ্ঞানকেই চিদাত্মক আত্মা বলি।

বস্তুত সাংখ্যাদি নিগুণবাদীরা কুদাপি শব্দাদি বিজ্ঞানকে আত্মা বলেন না। আত্মাকে বিজ্ঞানের বা বুদ্ধির অতিরিক্ত পদার্থ বলেন। উক্ত ব্রাহ্ম ধারণার বশবর্তী হইয়া গ্রন্থকার নিম্নে সেই মতের খণ্ডন করিতেছেন।

শব্দজ্ঞানং যদি তদা শব্দো গৃহ্যেত সর্বদা।

জ্ঞেয়ং বিনা তু কিং বেত্তি যেন জ্ঞানং নিরুচ্যতে ॥ ৫৭

৫৭। যদি আত্মা শব্দজ্ঞানাত্মক হয় (এবং তোমাদের মতে তাহা নিত্য বলিয়া), তবে শব্দ সর্বদাই গৃহীত হইতে থাকিবে। (এতদ্বারা আত্মবাদীরা বলিতে পারেন, শব্দজ্ঞান সর্বদা না থাকিলেও আত্মবিজ্ঞান

সর্বদা থাকে তাহা কদাপি নিরুদ্ধ হয় না) । পরন্তু শব্দাদি বিষয় সর্বদা থাকে না দেখা যায়, কিন্তু যদি বল যে জ্ঞান নিত্যই উপস্থিত থাকে, তবে বলি সেই জ্ঞানের জ্ঞেয় না থাকাতে তাহা কি জানে ? জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞান কিরূপে নিরূপিত হইতে পারে ? (ইহা সত্য বটে, কিন্তু আত্মবাদীরা বাহ্যবিষয়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান এই দ্বিবিধ জ্ঞান স্বীকার করেন । বাহ্যবিষয় না থাকিলেও আত্মজ্ঞান থাকে, কদাপি জ্ঞান যায় না বা নিবিষয় জ্ঞান হয় না । আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানের কদাপি—যতদিন বিজ্ঞান থাকে—অভাব হয় না, আত্মবিজ্ঞানের বিষয় আত্মা নিজেই ; তাই তাহাকে স্বপ্রকাশ বলিতে হয়) ।

অজানানং যদি জ্ঞানং কাষ্ঠং জ্ঞানং প্রসজ্যতে ।

তেনাসংনিহিতজ্ঞেয়ং জ্ঞানং নাস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৮

৫৮ । (জ্ঞেয়াভাবে) কিছু না জানিলেও যদি জ্ঞান হয় বল তবে কাষ্ঠও এক জ্ঞান হয় । অতএব জ্ঞেয়হীন জ্ঞান নাই ইহা নিশ্চয় ।

তদেব রূপং জানাতি তদা কিং ন শৃণোত্যপি ।

শব্দশ্রাসংনিধানাচ্ছেতুতস্তজ্ জ্ঞানমপ্যসং ॥ ৫৯

৫৯ । শব্দজ্ঞান যদি আত্মা হয়, তবে তাহা রূপগ্রহণ করিতে পারিবে না । আর তাহা যদি রূপ গ্রহণ করে তবে তাহা শ্রবণ করিবে না । যদি বল শব্দের অসন্নিধান হেতু শব্দ গ্রহীত হয় না, (তবে বলি) সেই কালের শব্দজ্ঞান অসং অর্থাৎ তাহা শব্দজ্ঞানই নহে ।

(বলা বাহুল্য সাংখ্যাদিরা শব্দজ্ঞানকে আত্মা বলেন না, আর শব্দজ্ঞান যে রূপজ্ঞান হয় একরূপও বলেন না । জ্ঞানশক্তি বা বুদ্ধি শব্দাদি বিষয়যোগে তাহা প্রকাশ করে ইহাই স্পষ্টত তাঁহাদের দ্বারা স্বীকৃত হয়) ।

শব্দগ্রহণরূপং যতুদ্রুপ-গ্রহণং কথং ।

একঃ পিতা চ পুত্রশ্চ কল্পাতে ন তু তত্ত্বতঃ ॥ ৬০

৬০ । যাহা ‘শব্দ গ্রহণ’ তাহা কিরূপে ‘রূপ গ্রহণ’ হইতে পারে ?

“পিতা ও পুত্র একই” এরূপ কথা কেবল কল্পিত মাত্র, ইহা তাত্ত্বিক কথা নহে ।

সত্ত্বং রজস্তমো বাপি ন পুত্রো ন পিতা যতঃ ।

শব্দগ্রহণযুক্তস্ত স্বভাবস্তশ্চ নেক্ষ্যতে ॥৬১

৬১ । সত্ত্ব, রজ বা তম এই (সাংখ্যসম্মত) ত্রিগুণ যখন স্বস্বভাবে অবস্থিত তখন তাহারা পিতাও নহে পুত্রও নহে । তাহাদের শব্দগ্রহণযুক্ত স্বভাব দেখা যায় না । (ইহাও গুণত্রয় সম্বন্ধে ভ্রান্তি । সত্ত্ব প্রকাশশীল, রজ ক্রিয়াশীল ও তম স্থিতিশীল । শব্দাদি সমস্ত ভাবেই ঐ তিন স্বভাব লক্ষিত হয় । বলয় কুণ্ডলাদিতে পরিণত স্তব্ধে যেমন স্তব্ধস্বভাব থাকে, কার্যসমূহে সেইরূপ গুণত্রয়েরও প্রকাশাদি স্বভাব থাকে । সাংখ্যেরা ‘পিতা পুত্র’ এই উপমা ব্যবহার করিয়া থাকিলে ঐ অর্থেই করিয়াছেন) ।

তদেবাগ্নেন রূপেণ নটবৎ সোহপ্যাশাস্বতঃ ।

স এবাগ্নস্বভাবশ্চৈদপূর্বেনং তদেকতা ॥৬২

৬২ । যদি বল নট যেমন এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়, শব্দজ্ঞানও সেইরূপ রূপাদিজ্ঞানরূপে প্রাকৃত হইত হয় । তাহা বলিলে সেই শব্দজ্ঞানরূপ আত্মা অশাস্বত বা অনিত্য হইবে । (সাংখ্যাদিরাও তাহাই বলেন । শব্দাদিজ্ঞান প্রাকৃত ভাব ও তাহারা অনিত্য । তাহা আত্মা নহে) । আর যদি বল সেই শব্দজ্ঞান এক হইলেও তাহার ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব উৎপন্ন হয়—তাহা হইলে বলি যে তাহার সেই একতা অপূর্ব পদার্থ ।

অন্যত্রপমসত্যং চেন্নিজং তত্রপমুচ্যতাং ।

জ্ঞানতা চেত্ততঃ সর্বপুংসামৈক্যং প্রসজ্যতে ॥৬৩

৬৩ । যদি বল আত্মার যে বিষয়োপাধিক রূপ তাহা অসত্য এবং তাহার নিজরূপই সত্য, তবে আত্মার জ্ঞানতামাত্র স্বরূপ হয় । তাহাতে সর্ব পুরুষের ঐক্য আত্মিয়া পড়ে । (ইহাও দোষাবহ নহে, সর্বপুরুষের মাত্র জাতিগত ঐক্য আছে) ।

চেতনাচেতনে চৈক্যং তয়োর্ধেনাস্তিতা সমা ।

বিশেষশ্চ যদা মিথ্যা কঃ সাদৃশ্যাশ্রয়স্তদা ॥ ৬৪

৬৪ । কিন্তু, চেতন (পুরুষ) ও অচেতন (প্রকৃতি) এই দুই পদার্থের অস্তিতা নামক সমান ধর্ম থাকাতে উহারা দুইই এক হয় । তাহাদের ভেদ বা বিশেষ যখন মিথ্যা, তখন তাহাদের সাদৃশ্য কোথায় ? বিশেষই সাদৃশ্যের আশ্রয় ; যেমন গো-সদৃশ গবয়, এস্থলে গোত্ববিশেষই গবয়ের সাদৃশ্যের আশ্রয় । গ্রন্থকারের মতে চেতনাচেতনের ভেদ যখন মিথ্যা তখন তাহাদের সাদৃশ্য নাই, সুতরাং চেতনের অস্তিতা নাই ।

(কিন্তু চেতনাত্মবাদীরা চেতন ও অচেতনের বা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের প্রকৃত ভেদ দেখান । অস্তিতাবিশয়ে সমান হইলেও দ্রব্যের ভেদ থাকিতে পারে । অশ্বও অস্তি, শৃগালও অস্তি, অতএব অশ্ব = শৃগাল, এরূপ ত্য়ায়াভাস গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তে আসে) ।

অচেতনশ্চ নৈবাহমাচৈতন্যাং পটাদিবৎ ।

অথ জ্ঞ শ্চেতনা যোগাদজ্ঞো নষ্টঃ প্রসজ্যতে ॥ ৬৫

৬৫ । চেতনাত্মবাদীদের মত নিরাস করিয়া অচেতনাত্মবাদীদের (গ্রন্থকারের মতে নৈয়ায়িকাদি—যাহারা আত্মাকে অচেতন ও চেতনাযোগে চেতন বলেন তাহাদের) মত নিরাস করিতেছেন ।

“আমি” (অহং) পটাদিবৎ অচেতন নহে, আচৈতন্য হেতু (আচৈতন্য = অচৈতন্যের ভাব বা অচেতনতা) । অর্থাৎ ঘটপটাদি যেরূপ অচেতন, কস্মকর্ভূত্বাদিযুক্ত বলিয়া আত্মা সেরূপ হইতে পারেন না । যদি বল যে আত্মা অচেতন হইলেও চেতনাযোগে বা বুদ্ধিযোগে জ্ঞ বা চেতন হন তাহাও সম্ভব নহে, কারণ মদ-মূর্ছাবস্থায় যখন চেতনা নিবৃত্ত হয়, তখন চেতন আত্মা নষ্ট হইয়া যাইবে । (নৈয়ায়িকেরা এতদূতরে বলিতে পারেন মূর্ছাবস্থাতেও চেতনার সম্যক্ নিবৃত্তি হয় না) ।

অথাবিকৃত এবাত্মা চৈতন্যেনাশ্চ কিং কৃতং ।

অজ্ঞশ্চ নিষ্ক্রিয়স্যৈবমাকাশশ্চাত্মতা মতা ॥ ৬৬

৬৬ । আর আত্মা যদি অবিকারী হন, তবে চৈতন্যযোগে তাঁহার কি হয় ? অর্থাৎ সদা অচেতন ও অবিকারী আত্মার বুদ্ধিযোগে চেতনতারূপ বিকার হওয়া সম্ভব নহে ।

এইরূপে অজ্ঞ, নিষ্ক্রিয়, আকাশকল্প পদার্থের আত্মতা আসিয়া পড়ে ।

ন কর্মফলসম্বন্ধো যুক্তশ্চেদাত্মনা বিনা ।

কর্মকৃত্বা দিনষ্টেহি ফলং কশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৬৭

৬৭ । যদি বল যে আত্মা-বিনা কর্মফলসম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, কারণ কর্ম করিয়া মৃত হইলে পরলোকগামী এক আত্মা না থাকিলে কাহার সেই কর্মের ফলভোগ হইবে ?

দ্বয়োরপ্যাবয়োঃ সিদ্ধে ভিন্নাধারে ক্রিয়াফলে ।

নির্ক্যাপারশ্চ তত্রাত্মেত্যত্র বাদো বৃথা নহু ॥ ৬৮

৬৮ । আমরাও (বুদ্ধেরাও) কর্মের ঐরূপ ফল স্বীকার করি । কিন্তু আমাদের উভয়ের মতে কর্মফল ভিন্নাধারে (দেহান্তরে) সিদ্ধ হয় । কিন্তু আত্মবাদ ও নৈরাত্ম্যবাদের মধ্যে আত্মবাদে আত্মা নির্বিকার নিষ্ক্রিয় ও নির্ক্যাপার । নির্ক্যাপার পদার্থের দ্বারা কর্মফলসিদ্ধি অসম্ভব বলিয়া আত্মবাদ বৃথা । (নৈয়ায়িকেরা বলিতে পারেন বুদ্ধিযুক্ত আত্মাই পরলোকে যায় সুতরাং কর্মফল সিদ্ধি কেবল মাত্র নির্ক্যাপার পদার্থের দ্বারা হয় না পরন্তু যাদৃশ পদার্থের দ্বারা কর্ম কৃত হয় তাদৃশ পদার্থেই তাহার ফলভোগ হয়) ।

হেতুমান্ ফলযোগীতি দৃশ্যতে নৈষ সম্ভবঃ ।

সন্তানশ্চৈক্যমাশ্রিত্য কর্তা ভোক্তেতি দেশিতং ॥ ৬৯

৬৯ । আত্মা না থাকিলে কৃতকর্মের বিপ্রণাশ ও অকৃতের অভ্যাগম হয় এই যে আপত্তি হয়, তদুত্তরে বক্তব্য যে—হেতুমান্ দ্রব্যই (কর্মকর্তা)

বে ফলযোগী (ফলভাগী) হয় সেইরূপ নিয়ম নাই । কারণ, একজন মৃত হয় আর অন্য ব্যক্তি পরলোকাদিতে উৎপন্ন হইয়া ফলভোগ করে । (স্থূল-শরীর সম্বন্ধে ইহা ঠিক বটে কিন্তু প্রকৃত ব্যক্তি যে অন্তঃকরণ তৎসম্বন্ধেই মতভেদ । বৌদ্ধেরা নিম্নলিখিত ভাবে উহা বুঝান) ।

সত্ত্বানের অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধরূপ ধর্ম সকলের পূর্বপরক্রমে প্রবাহের একত্ব আশ্রয় করিয়া “এক কর্ত্তা” “এক ভোক্তা” এরূপ একত্ব ভগবান্ প্রকাশ করিয়াছেন * (৮৯৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । ক্ষণে ক্ষণে নিরোধশীল ও উদয়-শীল ধর্মসত্ত্বানই আত্মা । সেই সত্ত্বানের এক অংশে কর্ম্মাচরণ হয় আর অণ্ডাংশে ফলভোগ হয় । “বস্মিন্বেব হি সত্ত্বানে আহিতা কর্ম্ম-বাসনা । ফলং তত্রৈব বদ্বাতি কর্পাসে রক্ততা যথা” । কিন্তু এই উদাহরণ একাত্ম-বাদীর প্রতিজ্ঞাকে অধিকতর দৃঢ় করে । তাঁহারা বলিবেন যে কর্পাস পূর্বপর একই দ্রব্য থাকে । রক্ততা তাহাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় বা নিকর হয় ।

অতীতানাগতং চিত্তং নাহং তন্ধি ন বিদ্বতে ।

অথোৎপন্ন মহং চিত্তং নষ্টেহস্মিনাস্ত্যাহং পুনঃ ॥৭০

৭০ । চিত্ত অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান । তন্মধ্যে অতীত ও অনাগত চিত্ত যথাক্রমে নষ্ট ও অজাত স্মৃতরাং অহং তাহা নহে । আর বর্ত্তমান চিত্ত

* “অহমেব তদাঙ্গীতি মিথ্যেয়ং পরিকল্পনা । অণ্ডএব মৃতো যস্মাদ্ অণ্ড-এব প্রজায়তে ॥” বৌদ্ধমতে আত্মা স্কন্ধ বা সমূহ মাত্র । এমন এক আত্ম-ভাব নাই যাহা ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করে । পূর্ব ক্রম সকল নিকর হইয়া অভিনব বা ভিন্ন ভিন্ন ক্রম সকল পর পর ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে স্মৃতরাং তন্মতে আত্মা প্রতিক্ষণে অভিনব বা ভিন্ন । “এক ব্যক্তি” অর্থে বৌদ্ধ দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন উদীয়মান ও লীয়মান ক্রম সমূহের সত্ত্বান বা প্রবাহ মাত্র ।

যদি অহং হয় তবে তাহা নষ্ট হইলে আর পুনঃ অহং থাকিবে না । (কিঞ্চ নাশ অর্থে অভাব নহে কিন্তু অবস্থান্তর, স্মৃতরাং অহং অবস্থান্তরে থাকে বলিতে হইবে) ।

যথৈব কদলীস্তুস্তো ন কশ্চিদ্ভাগশঃ কৃতঃ ।

তথাহমপ্যসদ্ভূতো মৃগ্যমাণো বিচারতঃ ॥ ৭১

৭১ । যেমন কদলীস্তুস্তকে বিভক্ত করিলে কিছুই থাকে না সেইরূপ বিচারপূর্বক অন্বেষণ করিলে অহং-ভাবও অসদ্ভূত হয় । (এখানেও গ্রায়-দোষ আছে । কদলীস্তুস্ত বিভক্ত হইলে কতকগুলি সংপদার্থে বিভক্ত হয়, অহং-প্রত্যয়ও সেইরূপ দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপ মৌলিক সংপদার্থে বিভক্ত হয় । স্মৃতরাং তাহার অসত্তা বাঙ্ণাত্র) ।

যদি সত্ত্বো ন বিত্তেত কস্তোপরি রূপেতি চেৎ ।

কার্য্যার্থমভ্যুপেতেন যো মোহেন প্রকল্লিতঃ ॥ ৭২

৭২ । আত্মপ্রতিষেধ-বিষয়ে অন্য বাধক নিবারণ করিতেছেন । যদি বলা যায় যে সত্ত্ব বা প্রাণী যদি না থাকে তবে কাহার উপর রূপা করা যায় (সত্ত্বের প্রতি রূপা বোধিসত্ত্বদের সাধন ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে) । এতদ্বত্তরে বলি—কার্য্যের বা পুরুষার্থের জন্ত স্বীকৃত ও মোহের (সংবৃতির দ্বারা প্রকল্লিত যে সত্ত্ব) তাহারই উপর রূপা করা যায় ।

কার্য্যং কশ্চ ন চেৎ সত্ত্বঃ সত্যমীহা তু মোহতঃ ।

দুঃখব্যাপশমার্থং তু কার্য্যমোহো ন বার্য্যতে ॥ ৭৩

৭৩ । যদি সত্ত্ব না থাকে তবে কাহার সেই পুরুষার্থরূপ কার্য্য ? অর্থাৎ কাহারও নহে । ইহা সত্য বা আমাদেরও অভিমত । আর পুরুষার্থ সাধনে যে স্ত্রী বা চেষ্টা হয় তাহা মোহবশেই হয় । (কাহার মোহ এবং মোহহীন কে তাহার উত্তর নাই) । দুঃখের উপশমের জন্ত কার্য্যগত মোহ বা দুঃখোপগমের জন্ত আবশ্যকীয় মোহ বারিত হয় না ।

দুঃখহেতুরহংকার আত্মমোহাত্ত্ব বর্দ্ধতে ।

ততোহপি ন নিবর্ত্য শ্চেৎ বরং নৈরাশ্র্যভাবনা ॥ ৭৪

৭৪ । কার্যমোহের দ্বারা আত্মমোহও বারিত কর না কেন?—দুঃখ-
হেতু যে অহংকার তাহা আত্মমোহ হইতে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া তাহা করি
না । যখন আত্মমোহের দ্বারা অহংকার নিবর্তিত করা সাধ্য নহে, তখন
নৈরাশ্র্যভাবনাই শ্রেয় । (কিন্তু আত্মমোহ ব্যতীত দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা
হওয়াও সম্ভব নহে, এমন নৈরাশ্র্যভাবনাও আত্মমোহ বিশেষ । যেমন
সংকল্পের নিরোধ “নিরোধ করিব” এইরূপ এক সংকল্পের দ্বারা হয় সেইরূপ
অহংকারও অত্র এক অহংকারের (আমি শূন্য এতদ্রূপ কল্পনাত্মক) দ্বারা
নিবর্তিত হয়) ।

কায়ো ন পাদৌ ন জজ্বা নোরু কায়ঃ কটি ন' চ ।

নোদরং নাপ্যয়ং পৃষ্ঠং নোরো বাহু ন চাপি সঃ ॥ ৭৫

ন হস্তৌ নাপ্যয়ং পার্শ্বৌ ন কক্ষৌ নাংসলক্ষণঃ ।

ন গ্রীবা ন শিরঃ কায়ঃ কায়োহত্র কতরঃ পুনঃ ॥ ৭৬

যদি সর্বেষু কায়োহয়মেকদেশেন বর্দ্ধতে ।

অংশা অংশেষু বর্দ্ধন্তে স চ কুত্র স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ৭৭

৭৫-৭৬-৭৭ । নৈরাশ্র্য দেখাইয়া কায়ের অনিত্যতা-স্মৃতির বিষয়
বলিতেছেন । পাদদ্বয়, জজ্বা, উরুদ্বয়, কটি, উদর, পৃষ্ঠ, উরঃ, বাহুদ্বয়,
হস্তদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, কক্ষদ্বয়, অংস, গ্রীবা ও শির এই সকল অঙ্গের মধ্যে
কোনটা কায় ?

যদি বল যে এসকলের অবয়বের মধ্যে একদেশ ব্যাপ্ত করিয়া কায়
বর্তমান আছে তাহাও ঠিক নহে কারণ অংশ সকলই অংশে বর্তমান
আছে, উহার মধ্যে কায় নিজে কোথায় আছে ?

সর্বাশ্রনা চেৎ সর্বত্র স্থিতঃ কায়ঃ করাদিষু ।

কায়ান্তাবস্ত এব স্মার্যাবস্তন্তে করাদয়ঃ ॥ ৭৮

৭৮। আর যদি বল করাদি সমস্ত অঙ্গের সর্বাঙ্গায় কায় অবস্থিত আছে তাহা হইলে করাদি যত সংখ্যক, কায়ও তত সংখ্যক।

নৈবাস্ত ন বহিঃ কায়ঃ কথং কায়ঃ করাদিষু।

করাদিভ্যঃ পৃথগ্ নাস্তি কথং নু খলু বিদ্যতে ॥ ৭৯

৭৯। অতএব কায়, করাদির অন্তরে বা বাহিরে নাই, আর করচরণাদি হইতে পৃথকও নাই, অতএব কায় কোথায় আছে ?

তন্নাস্তি কায়মোহাত্তু কায়বুদ্ধিঃ করাদিষু।

সন্নিবেশবিশেষেণ স্থাগৌ পুরুষবুদ্ধিবৎ ॥ ৮০

৮০। সেইহেতু কায় বলিয়া কিছু নাই। মোহবশতই করাদিতে কায়বুদ্ধি হয়। যেমন সন্নিবেশবিশেষে স্থাগুতে পুরুষবুদ্ধি হয় কায়বুদ্ধিও তদ্বৎ।

(বলা বাহুল্য এই যুক্তি অসমীচীন। ইহা নৈরাশ্র্যবাদের প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হয়। সমষ্টির সঙ্কেতীকৃত নামই কায়। যদি করচরণাদি নাম না থাকিত, বা কেহ উহা না জানে, তাহা হইলে বা তাহার কাছে এই শব্দময় যুক্তি থাকিত না। আশ্র্যবাদীরাও অহংভাবের সর্বাংশকে আশ্র্য বলেন না। মনবুদ্ধি আদিকে মনবুদ্ধিই বলেন। কিন্তু অহংভাবের অন্ততম মূল পদার্থকেই আশ্র্য বলেন। উক্ত যুক্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে স্তূর্ণবলয়ের লতাপাতা আদি অবয়বের মধ্যে যেমন এক স্তূর্ণই সত্য, অন্ত সব মিথ্যা, তেমনি অহংভাবের মধ্যেও প্রকৃতিপুরুষই সত্য অন্ত সব মোহকল্পিত ভেদমাত্র। পরন্তু ঐ যুক্তি উল্টাইয়া বলা যাইতে পারে যে করচরণাদিরা কায় ছাড়া কিছুই নহে। করচরণাদির ভেদ মোহকল্পিত, মাত্র কায়ই সত্য। মোহইবা কোথা আছে)।

যাবৎ প্রত্যয়সামগ্রী তাবৎ কায়ঃ পুমানিব।

এবং করাদৌ সাশ্র্যবত্তাবৎকায়োহত্র দৃশ্যতে ॥ ৮১

৮১। যাবৎকাল প্রত্যয়ের (বিপর্যস্তবুদ্ধিরূপ হেতুর) সামগ্রী বা

সমবধান, তাবৎকাল কাষ্ঠ বা স্থাপু মানুষ্যের মত প্রতীত হয় ; সেইরূপ করাদিতে যতকাল প্রত্যয় সামগ্রী থাকে ততকাল তাহা কার বলিয়া কল্পিত হয় ।

এবমঙ্গুলিপুঞ্জত্বাৎ পাদোহপি কতরো ভবেৎ ।

সোহপি পর্বসমূহত্বাৎ পর্বাপি স্বাংশভেদতঃ ॥ ৮২

৮২ । শব্দ হইতে পারে অঙ্গসমবার যে দেহ তাহা সত্য না হইলেও অঙ্গসকল সত্য দ্রব্য । তদ্বত্তরে বলিতেছেন—পূর্বেক্তে গ্ৰায়ে পাদও অঙ্গুলিপুঞ্জ, সূতরাং কিছু নহে । অঙ্গুলিপুঞ্জও পর্বসমষ্টি, সূতরাং কিছু নহে ; পর্বসকলও স্বাংশভেদে ভিন্ন হইলে কিছুই হয় না ।

অংশা অপ্যণ্ডভেদেন সোহপ্যণ্ডিগ্নিভাগতঃ ।

দিগ্নিভাগো নিরংশত্বাদাকাশং তেন নাস্ত্যণ্ডঃ ॥ ৮৩

৮৩ । সেই পর্বাংশসকল অণ্ডভেদে বিভক্ত হইলে কিছুই হয় না ; অঙ্গসকলও দিগ্নিভাগে বিভক্ত হয় (বৌদ্ধমতে অণ্ড ষড়ংশ) । দিগ্নিভাগ নিরংশ বলিয়া তাহা আকাশ বা শূন্য, সূতরাং অণ্ডও নাই ।

(এই যুক্তির গ্ৰাহ্যদোষ অঙ্কের দ্বারাও দেখান যায় । কোন পরিমাণকে সতাই ভাগ করনা, সর্বদাই কিছু না কিছু থাকিবে । কোটিভাগ শতকোটি ভাগ, কোটি কোটি ভাগ ইত্যাদি কিছু না কিছু হইবেই হইবে, কারণ সংখ্যার সীমা নাই । সূতরাং এইরূপে শূন্য প্রমাণ করিতে যাওয়া ব্যর্থ প্রয়াস । পরন্তু পরমাণুবাদীরা পরমাণুকেই নিরংশ বলেন । পরমাণুর অংশ দিক্ ইত্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন, আবার দিক্কে শূন্য বলিয়াছেন, সূতরাং তাঁহার বলা হইল পরমাণুর অংশ শূন্য বা পরমাণু = অংশশূন্য অর্থাৎ পরমাণুর আর অংশ নাই । ফলত এরূপ বিচার একটা চিরন্তন গ্ৰাহ্যদোষ) ।

এবং স্বপ্নোপমে রূপে কো রজ্যেত বিচারকঃ ।

কারশ্চৈবং যদা নাস্তি তদা কা স্তী পুমাংশ্চ কঃ ॥ ৮৪

৮৪। এই হেতু স্বপ্নোপম রূপে কোন্ বিচারক ব্যক্তি অনুরক্ত হইবেন? কারই যখন নাই তখন কে পুরুষ কেই বা স্ত্রী? (দেহটা শূন্য এরূপ প্রেমের না হইলেও উহা যে অবয়বসমষ্টি এরূপ চিন্তা করিয়া তাহাতে রাগ উঠাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করা সনীচীন প্রথা। ইহার নাম কারস্বত্ব্যপস্থান)।

যত্বস্তি দুঃখং তদ্বেন প্রহৃষ্টান্ কিং ন বাধতে।

শোকাচ্ছাভায় মৃষ্টাদি সুখং চেৎ কিং ন রোচতে ॥ ৮৫

৮৫। অতঃপর বেদনা-স্বত্ব্যপস্থান কথিত হইতেছে। বেদনা = সুখ, দুঃখ ও অদুঃখাসুখ।

দুঃখ যদি তাত্ত্বিকভাব হয় তবে প্রহৃষ্টদের তাহা বাধিত করে না কেন? আর মৃষ্টাদি (সুরস অনুরপাদি) যদি সুখ হয় তবে শোকাদির দ্বারা আন্ত ব্যক্তিদের তাহা ভাল লাগে না কেন?

বলীরসাভিভূতত্বাদি তন্নানুভূয়তে।

বেদনাত্বং কথং তশ্চ যশ্চ নানুভবায়িতা ॥ ৮৬

৮৬। যদি বল বলীর অগ্র ভাবের দ্বারা অভিভূত হওয়াতেই সেক্ষেত্রে সুখ দুঃখ অনুভূত হয় না, তবে বলি যাহার অনুভবায়িতা নাই তাহার বেদনাত্ব কোথায়?

অস্তি সূক্ষ্মতয়া দুঃখং স্থৌল্যং তশ্চ হৃতং ননু।

তুষ্টিমাত্রাহপরা চেৎশ্রাত্স্বাৎসান্যশ্চ সূক্ষ্মতা ॥ ৮৭

৮৭। যদি বলা যায় যে তখন দুঃখ সূক্ষ্মভাবে থাকে আর তাহার স্থৌল্য তখন অপগত হয় তাহাও ঠিক নহে, কারণ তখন তুষ্টির মাত্রা যদি অল্প হয় তাহা হইলে তাহা সুখেরই সূক্ষ্মতা দুঃখের নহে।

বিরুদ্ধপ্রত্যয়োৎপত্তৌ দুঃখশ্চানুদয়ো যদি।

কল্পনাভিনিবেশেঃ্চি বেদনেত্যাগতং ননু ॥ ৮৮

৮৮। সুখকালে দুঃখ হয় না কেন, তদ্বৃত্তরে যদি বলা যায় যে তখন

বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের বা হেতুর উৎপাদ হইতেই দুঃখ হয় না, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সুখাদি বেদনা কেবল কল্পনার দ্বারা অভিনিবেশ মাত্র । দুঃখ উপস্থিত হইলেও যদি তদ্বিরুদ্ধ হেতুতে অভিনিবিষ্ট হওয়া যায়, তবে দুঃখ কোন এক বেদনাই হয় না । সুখ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম ।

অতএব বিচারোহয়ং প্রতিপক্ষোহশ্চ ভাব্যতে ।

বিরুদ্ধ-ক্ষেত্রসম্মত-ধ্যানাহারা হি যোগিনঃ ॥ ৮৯

৮৯ । অতএব এই সিদ্ধান্ত আসিতেছে যে বেদনা যখন অভিনিবেশ-স্বভাব তখন সেই সুখাদি অভিনিবেশের প্রতিপক্ষ ভাবনা করিলে তাহা নিরাকৃত হইতে পারে । এইজন্য যোগীরাও কল্পনাসম্মত ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইয়া অতীষ্টকাল প্রীতিসুখ অনুভব করিয়া বর্তমান থাকেন । তাদৃশ কল্পনীয় বিষয়ের ধ্যানাহারেই তাহারা জীবিত থাকেন বলা যাইতে পারে ।

সান্তরাবিন্দ্রিয়ার্থে চেৎ সংসর্গঃ কুত এতয়োঃ ।

নিরন্তরত্বেহপ্যেকত্বং কশ্চ কেনাস্ত সঙ্গতিঃ ॥ ৯০

৯০ । বেদনা বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্পর্কজনিত, সেই মিলন যে অসম্ভব, সূত্রাং বেদনা যে কিছুই নহে, তাহা দেখাইতেছেন । ইন্দ্রিয় ও বিষয় যদি অন্তরালযুক্ত হয় তবে তাহাদের মিলন অসম্ভব । আর তাহারা যদি নিরন্তর (অন্তরালহীন) হয়, তবে তাহারা এক, অতএব কাহার সহিত কাহার মিলন হইবে ?

নাগোরণো প্রবেশোহস্তি নিরাকাশঃ সমশ্চ সঃ ।

অপ্রবেশে ন মিশ্রত্বমিশ্রত্বে ন সঙ্গতিঃ ॥ ৯১

৯১ । পরমাণু নিরংশ, সূত্রাং তাহাদের সংসর্গ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে এই মত নিরাকরণ করিতেছেন । অণুর মধ্যে অণুর প্রবেশ হওয়া সম্ভব নহে, কারণ তাহা অচ্ছিন্ন বা নিরাকাশ এবং সম বা নিম্নোন্নততাহীন তুল্য । অতএব অণুর ভিতর অণুর প্রবেশ নহে ঘটিলে তাহাদের মিশ্রত্ব ঘটে না, সূত্রাং সংসর্গও ঘটে না ।

নিরংশস্ত চ সংসর্গঃ কথং নামোপপত্ততে ।

সংসর্গে চ নিরংশস্তং যদি দৃষ্টং নিদর্শয় ॥ ৯২

৯২ । পরন্তু নিরংশের সহিত সংসর্গ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ? ছই দ্রবোর সংসর্গ আছে অথচ তাহার নিরংশ এরূপ যদি দেখিয়া থাক তবে উদাস্ত কর ।

বিজ্ঞানস্য ত্বমূর্তস্য সংসর্গো নৈব যুজ্যতে ।

সমূহস্যাপ্যবস্ত্ত্বাণ্যথা পূর্ব্বং বিচারিতং ॥ ৯৩

৯৩ । বিজ্ঞান পদার্থ অমূর্ত, তাহার সহিত সংসর্গ হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে । অতএব বিষয়, ইন্দ্রিয় ও বিজ্ঞানের সংসর্গে বেদনা হয় ইহা ঠিক নহে । পরন্তু ঐ তিনের সংঘাতও অবস্ত, কারণ পূর্ব্ব (৯৮৬) বিচারিত হইয়াছে যে সমূহ অবস্ত ।

(স্থূল ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপাদির সংসর্গ প্রত্যক্ষত দেখা যায় । ইন্দ্রিয়-গোলকের সহিত বিজ্ঞান কিরূপে সম্বন্ধ তাহা উক্তরূপ পরমাণু কল্পনা করিয়া বুঝা যাইতে না পারে কিন্তু তাহাদের সংসর্গ স্বীকার না করিলে চলে না । অভিনিবেশ বলিলেও সংসর্গ আসে । সাংখ্যমতে গ্রহণ ও গ্রাহ উভয়ই অভিমানাত্মক । ঐ প্রথাতেই উহা বুঝা যায়) ।

তদেবং স্পর্শনাভাবে বেদনাসম্ভবঃ কুতঃ ।

কিমর্থময়মায়াসঃ বাধা কস্য কুতো ভবেৎ ॥ ৯৪

৯৪ । এইরূপে স্পর্শের অভাবে বেদনা কিরূপে সিদ্ধ হয় ? অতএব স্পর্শের প্রাপ্তির ও দুঃখের পরিহারের জন্ত এই প্রয়াস কেন ? আর কাহার (বেদক আত্মা নাই বলিয়া) কি হইতে (উপঘাতহেতু দুঃখও কিছু নয় বলিয়া) বাধা হয় ?

যদা ন বেদকঃ কশ্চিৎবেদনা চ ন বিদ্যতে ।

তদাষস্থামিমাং দৃষ্ট্বা তৃষেৎ কিং ন বিদীধ্যাসে ॥ ৯৫

৯৫ । যখন কেহ বেদক নাই আর বেদনাও যখন নাই তখন হে

তৃষ্ণে ! এবংবিধ অবস্থা (নিজের জন্ম হেতুর শূন্যতারূপ অবস্থা) দেখিয়া তুমি বিদীর্ণ হওনা কেন ? [বিরুদ্ধবাদী এস্থলে বলিতে পারে তৃষ্ণাও যে নাই তাহা আবার “বিদীর্ণ হবে” কিরূপে ? কিঞ্চিৎ ‘বিদীর্ণতাও’ নাই ‘হওয়াও’ নাই । ফলতঃ এইরূপ মায়াবাদে সবই অসং, কিন্তু প্রয়োজনানুরোধে কোনটাকে একবার সং ধরিয়া অপর কোনটাকে অসং ধরিয়া বলাতে ঐ বাদটা প্রলাপবৎ হইয়া উঠে । বেদক, বেদনা ও তৃষ্ণা এই তিনের সত্তা বা অসত্তা সমান । তিনই নাই অতএব বিদীর্ণ কে হবে ? হয় এরূপ বল (অথবা তাহাও বলা ব্যর্থ), না হয় বল তিনই আছে । ইহার মধ্যে তৃষ্ণানাশ কর্তব্য, বিষয়াভিনিবেশ নাশে বেদনা যার ইত্যাদি কথা সমীচীন । কিন্তু এই যে মায়াবাদ নামক দৃষ্টি অনুসারে উহা সাধন করিতে বলা হইয়াছে সেই বাদটা সমীচীন নহে] ।

দৃশ্যতে স্পৃশ্যতে চাপি স্বপ্নমারোপমানানা ।

চিত্তেন সহজাতত্বাৎ বেদনা তেন নেক্ষ্যতে । ৯৬

৯৬ । স্বপ্নমারোপম চিত্তের দ্বারা বিষয় দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট হয় । কারণ তাহা চিত্তের সহিতই উৎপন্ন হয় । অতএব বেদনা বস্তুত নাই ।

পূর্বাং পশ্চাচ্চ জ্ঞাতেন স্বর্ঘ্যতে নানুভূয়তে ।

স্বাভ্যানং নানুভবতি ন চাত্তেনানুভূয়তে ॥ ৯৭

৯৭ । পূর্বেবেদনা পশ্চাৎজ্ঞাত জ্ঞানের দ্বারা স্বরণ করা যায় কিন্তু অনুভব (সাক্ষাৎ জ্ঞান) করা যায় না (তৎকালে অবিদ্যমান হেতু) । বেদনা নিজেকে অনুভব করে না (স্বসংবেদন সিদ্ধ নহে বলিয়া) এবং অন্য কেহও অনুভব করেনা । অতএব বেদনা স্বরণমাত্র স্মৃতরাং অসং (স্বরণটা অসং কেন ? তাহার উত্তর নাই) ।

ন চাস্তি বেদকঃ কশ্চিৎ বেদনাতো ন তদ্বতঃ ।

নিরাশ্রয়ে কল্যাপেতস্মিন্ ক এব বাধ্যতেহনয়া ॥ ৯৮

৯৮ । বেদক বলিয়া কেহ নাই স্মৃতরাং বেদন তদ্বত নাই । এ

আত্মহীন কলাপে (পঞ্চক্করূপে) কে বেদনার দ্বারা বাধিত হইবে ?
ফলতঃ সুখদুঃখাদি বেদনা কিছু নহে, ব' শূন্যস্বভাব স্মুতরাং তাহাতে
উদ্বিগ্ন হওয়া অকর্তব্য এইরূপ স্মৃতির উপস্থানই সাধ্য বেদনাস্মৃত্যুপস্থান ।

নেদ্রিয়েষু ন রূপাদৌ নান্তুরালে মনঃস্থিতং ।

নাপ্যন্তন' বহিষ্চিত্তমন্ত্রাপি ন লভ্যতে ॥৯৯

৯৯ । অতঃপর চিত্তস্মৃত্যুপস্থান বলা যাইতেছে । মন ইন্দ্রিয়গণে নাই
রূপাদিতে নাই কিম্বা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের অন্তুরালেও নাই । অন্তরে ও
বাহিরে বা অন্ত কোথাও চিত্ত পাওয়া যায় না ।

যন্ন কায়ে ন চাত্তত্র ন মিশ্রং ন পৃথক্ কচিৎ ।

যন্ন কিংচিদতঃ সত্ত্বাঃ প্রকৃত্যা পরিনির্বৃত্তাঃ ॥১০০

১০০ । যাহা শরীরে বা অত্তত্র নাই বা বাহ্যভ্যন্তরে ও মিশ্রভাবে
নাই বা পৃথক্ভাবেও নাই, তাহা স্মুতরাং কোন বস্তু নহে । অতএব সত্ত্বগণ
প্রকৃতিত পরিনির্বৃত্ত বা মুক্তস্বভাব ।

জ্ঞেয়াৎপূর্বং যদি জ্ঞানং কিমালম্ব্যাস্ত সন্তবঃ ।

জ্ঞেয়েন সহ চেজ্ জ্ঞানং কিমালম্ব্যাস্ত সন্তবঃ ॥১০১

অথ জ্ঞেয়াদ্ভবেং পশ্চাত্তদা জ্ঞানং কুতো ভবেৎ ।

এবং চ সর্বধর্মাণামুৎপত্তিন'বসীয়তে ॥১০২

১০১।১০২ । জ্ঞেয়ের পূর্বে যদি জ্ঞান হয় অথবা জ্ঞেয়ের সহিত যদি
জ্ঞান হয় তবে তাহা কি আলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইবে ? আর জ্ঞেয় হইতে
যদি পশ্চাৎ জ্ঞান হয়, তবেই বা জ্ঞান কিরূপে হইবে ? জ্ঞেয়ের পূর্বে হইলে
জ্ঞেয় আলম্বন হইবে না, সহ হইলেও জ্ঞেয় জ্ঞানের পূর্বভাবিকারণ বা
আলম্বন হইবে না, আর পশ্চাৎ হইলে জ্ঞানকালে জ্ঞেয় থাকে না বলিয়া
আলম্বন হইবে না । অতএব চিত্ত শূন্য এইরূপ ভাবনীয় । ইহাই চিত্তস্মৃত্যু-
পস্থান । ধর্মস্মৃত্যুপস্থান যথা— “এইরূপে সর্বধর্মের উৎপত্তি প্রতীত হয় না ।”
উৎপত্তি না হইলে নিরোধও হয় না, অতএব সর্বধর্ম উৎপত্তি-নিরোধহীন শূন্য ।

• (এই সকল স্বত্ব্যপস্থান সাধন করা চিত্তনিরোধের উপায় বটে, কিন্তু যে যুক্তিতে উহার কর্তব্যতা সিদ্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা যে নিতান্ত অসার তাহা সহজেই বুঝা যায়) ।

যথেষ্টং সংবৃত্তিনাস্তি ততঃ সত্যদ্বয়ং কুতঃ ।

অথ সাপ্যন্তসংবৃত্ত্যা স্তাৎসত্ত্বো নিবৃত্তঃ কুতঃ ॥১০৩

১০৩ । সর্বধর্মের শূন্যতা কথিত হইল । বলিতে পার—যদি তাহা ঠিক হয় তাহা হইলে সত্যদ্বয় (৯২) কিরূপে যুক্ত হয় (কারণ ইহাতে সংবৃত্তিসত্য নাই বলা হইল) । আর যদি বলা যায় যে অন্ত (অমুক্ত ব্যক্তির) সংবৃত্তির দ্বারা সংবৃত্তিসত্য দৃষ্ট হইতে থাকে, তাহা হইলে শঙ্কা হইবে যে নির্বাণ প্রাপ্ত পুরুষও যখন অন্তের সংবৃত্তির বা বুদ্ধির দ্বারা বিষয়ীকৃত হয়, তখন সত্ত্ব বরাবরই থাকিবে কদাপি নিবৃত্ত (নির্বাণপ্রাপ্ত বা শূন্যভূত) হইবে না ।

পরচিত্তবিকল্পোহসৌ স্বসংবৃত্ত্যা তু নাস্তি সঃ ।

স পশ্চাৎনিয়তঃ সোহস্তি ন চেন্নাস্ত্যেব সংবৃত্তিঃ ॥১০৪

১০৪ । শঙ্কার উত্তর—সেই যে নিবৃত্তসত্ত্বকে বিষয়ীকরণ, তাহা পরচিত্তের কল্পনামাত্র । নিবৃত্তের স্বসংবৃত্তির দ্বারা সেই পরিনিবৃত্তসত্ত্ব থাকিবে না । (কারণ তাহার সংবৃত্তিই তখন থাকিবে না) । “ইহার পর ইহা হয়” এরূপ নিয়মবুদ্ধি থাকিলেই সংবৃত্তি থাকে । পরিনিবৃত্ত পুরুষের তাহা যখন থাকে না তখন সংবৃত্তিও থাকে না ।

কল্পনা কল্পিতং চেতি দ্বয়মন্তোত্তানিশ্রিতং ।

যথাপ্রসিদ্ধমাশ্রিত্য বিচারঃ সর্ব উচ্যতে ॥১০৫

১০৫ । কল্পনা এবং কল্পিত বিষয় এই দুইটী অন্তোত্তানিশ্রিত । যথা-প্রসিদ্ধকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ লোকব্যবহার গ্রহণ করিয়া সমস্ত বিচার বলা হয় ।

বিচারিতেন তু যদা বিচারেণ বিচার্যতে ।

তদানবস্থা তস্মাপি বিচারশ্চ বিচারণাৎ ॥১০৬

১০৬ । বিচারও যখন কাল্পনিক স্বভাব, তখন তাহাও বিচার্য্য একরূপ শঙ্কার উত্তর দিতেছেন । বিচারিত বিষয় পুনঃ বিচারের দ্বারা বিচার করিলে তাহাতে অনবস্থা দোষ হয় । কারণ, তাহাতে বিচারের বিচার তাহার বিচার ইত্যাদি অপ্রতিষ্ঠা আসে ।

বিচারিতে বিচার্য্যে তু বিচারশ্চাস্তি নাশয়ঃ ।

নিরাশ্রয়ত্বান্নোদেতি তচ্চ নির্বাণমুচ্যতে ॥১০৭

১০৭ । বিচার্য্য বিষয় বিচারিত হইয়া গেলে আর বিচারের আশ্রয় থাকে না । নিরাশ্রয়ত্ব হেতু আর কোন বিচার উঠে না তখন সেই নির্বিচার অবস্থাকে নির্বাণ বলা যায় ।

যশ্চ ত্বেতদ্বয়ং সত্যং স এবাত্যস্তদুঃস্থিতঃ ।

যদি জ্ঞানবশাদর্থো জ্ঞানাস্তিত্বে তু কা গতিঃ ॥১০৮

১০৮ । যাহার নিকট বিচার ও বিচার্য্য এই দুই ভাব পরমার্থ সত্য সে অত্যন্ত দুঃস্থিত ব্যক্তি (কারণ তাহার কদাপি নির্বাণ হইবে না) । যদি জ্ঞানবশে বা প্রমাণসামর্থ্যে অর্থ বা প্রমের ব্যবস্থাপিত হয় একরূপ বল তাহাতেও জ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না । কারণ স্বসংবেদন এইমতে স্বীকৃত নাই সূতরাং জ্ঞানের অস্তিত্ব কিসের দ্বারা নিরূপিত হইবে ? (অতএব জ্ঞান শূন্যস্বভাব সূতরাং বিচার ও বিচার্য্য পরমার্থ সত্য নহে) ।

অথ জ্ঞেয়বশাজ্জ্ঞানং জ্ঞেয়াস্তিত্বে তু কা গতিঃ ।

অথাত্মোত্তরবশাৎসত্ত্বমভাবঃ স্যাৎস্বয়োরপি ॥১০৯

১০৯ । আর যদি বল জ্ঞেয়বশে জ্ঞান হয়, তবে জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে ? পরস্পরের বশে যদি পরস্পরের সত্তা হয়, তবে উভয়েরই অভাব হইবে । (বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারে “উভয়েরই ভাব হইবে”) ।

পিতা চেন্ন বিনা পুত্রাৎ কুতঃ পুত্রস্য সম্ভবঃ ।

পুত্রাভাবে পিতা নাস্তি তথাসঙ্ঘং তয়োদ্বয়োঃ ॥ ১১০

১১০ । যদি পুত্রবিনা পিতা না থাকে তবে পুত্র কিরূপে হইবে ?
পুত্রের অভাবে পিতাও থাকে না । সেইরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই দুইয়ের
একতরের অভাব বলিয়া উভয়েরই অভাব ।

(বলা বাহুল্য পুত্র হওয়া না থাকিলে পিতা ‘শব্দ’ থাকিত না । যখন
তাহা আছে তখন উভয়ই আছে । সেইরূপ জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ও আছে) ।

অঙ্কুরো জায়তে বীজাদ্বীজং তেনৈব সূচ্যতে ।

জ্ঞেয়াজ্জ্ঞানেন জাতেন তৎসত্তা কিং ন গম্যতে ॥ ১১১

১১১ । শব্দা হইতে পারে—অঙ্কুর বীজ হইতে জন্মায় তাহাতে বীজ
সূচিত হয় । সেইরূপ জ্ঞেয় হইতে জ্ঞান জাত হয়, অতএব তাহাও
(জ্ঞেয়ের) সত্তা কেননা উপলব্ধ হইবে ?

অঙ্কুরাদন্ততো জ্ঞানাদ্বীজমন্তীতি গম্যতে ।

জ্ঞানাস্তিত্বং কুতো জ্ঞাতং জ্ঞেয়ং যত্তেন গম্যতে ॥ ১১২

১১২ । শব্দার উত্তর—জ্ঞানপদার্থ অঙ্কুর হইতে ভিন্ন । সেই জ্ঞানের
দ্বারা বীজ আছে বলিয়া নিশ্চিত হয় । কিন্তু জ্ঞানের অস্তিত্ব কিরূপে জানা
যাইবে (এই বাদে স্বসংনেদন স্বীকৃত নহে বলিয়া) তাহাতে জ্ঞেয়ের সত্তা
নিশ্চিত হইবে ? (বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারেন—জ্ঞানাস্তিত্ব যে নাই তাহা
কিরূপে জানা যাইবে ?)

এইরূপে মাধ্যমিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়া দলেন যে “বাস্তবপক্ষে জ্ঞান ও
জ্ঞেয় সিদ্ধ হয় না বলিয়া বিচার করা চলেনা । কাল্পনিক পক্ষে যথা-প্রসিদ্ধ
ব্যবহার আশ্রয় করিয়া বিচার চলে ।” ইহাতে বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারেন
যে বিচার যখন ব্যবহারিক তখন তাহাতে অব্যবহারিক পদার্থ আনা
সর্বথা অযুক্ত । ব্যবহারিক সত্তা ও অসত্তা লইয়া বিচার করিলে সতের
অভাব ও অসতের ভাব বলা সম্ভব হইতে পারে না । ঐ যথাপ্রসিদ্ধ সত্য

লইয়া বিচার করা উচিত । ব্যবহারত দেখা যায় সমস্ত সং পদার্থ (বিকারী হইলে) অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, অসং হয় না । আর যাহা অসং তাহার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্যই নহে । পরমার্থের জন্ত কোন নির্বিকার পদার্থ স্বীকার করিলে তাহাকে বিকারী পদার্থের বিরুদ্ধধর্মী অথচ সংপদার্থ স্বীকার করিতে হইবে ; সাংখ্যের পুরুষ তাদৃশ পদার্থ) ।

লোকঃ প্রত্যক্ষতস্তাবৎসর্কং হেতুমুদীক্ষতে ।

পদানালাদিভেদো হি হেতুভেদেন জায়তে ॥১১৩

১১৩ । কোনও ভাবপদার্থ স্বত, পরত, স্বত-পরত বা অহেতুতে উৎপন্ন হয় না । ইহা বৌদ্ধমত । তদ্বিরুদ্ধ স্বভাববাদীদের মত নিরসিত হইতেছে । তাঁহারা বলেন রাজীবকেশরের বৈচিত্র্য, ময়ূরচন্দ্রিকা, কণ্টকের তৈক্ষ্য আদি অহেতুতে স্বভাবত উৎপন্ন হয় । তদ্বত্তরে বলিতেছেন—লোকেদের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া সর্কদ্রব্যের হেতু প্রদিত হয় । পদানালাদির ভেদ হেতুর ভেদেই উৎপন্ন হয়, অহেতুতে নহে ।

কিংকৃতো হেতুভেদশ্চৎ পূর্বহেতু প্রভেদতঃ ।

কস্মাচ্ছেৎ ফলদো হেতুঃ পূর্বহেতুপ্রভাবতঃ ॥১১৪

১১৪ । সেই হেতুভেদ কিরূপে হয় ? পূর্বহেতুর প্রভেদ হইতে তাহা হয় । হেতু কেন ফলদ হয় ?—পূর্বহেতুর প্রভাবেই তাহা হয় ।

ঈশ্বরো জগতো হেতুঃ বদ কস্তাবদীশ্বরঃ ।

ভূতানি চেদ্ববদেবং নামমাত্রৈহপি কিংশ্রমঃ ॥ ১১৫

১১৫ । স্বভাববাদ নিরাকরণ করিয়া ঈশ্বরবাদ নিরাকরণ করিতেছেন । হেতু ব্যতীত কার্য্য হয় না ইহা সত্য, কিন্তু সেই হেতু ঈশ্বর বা শঙ্কর (ইহা ঈশ্বরবাদীর মত, তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য) বল সেই ঈশ্বর কে ? (পৃথিব্যাদি ভূতই ত সমস্তের কারণ দেখা যায় অতএব) পৃথিব্যাদি ভূতই কি ঈশ্বর ? তাহা হইলে ভিন্ন নাম মাত্র লইয়া শ্রম করা হইতেছে ।

অপিত্বনেকেহনিত্যাশ্চ নিশ্চেষ্টা ন চ দেবতাঃ ।

লজ্জ্যাশ্চাশুচয়শ্চৈব স্মাদয়ো ন স ঈশ্বরঃ ॥ ১১৬

১১৬। অপিচ অনেক, অনিত্য, নিশ্চেষ্ট, অতিক্রমণীয় ও অশুচি পার্থিবাদি দ্রব্য আছে, তাহারা দেবতা বা ঈশ্বর হইতে পারে না।

নাকাশমীশোহ্চেষ্টত্বাং নাত্মা পূৰ্বনিষেধতঃ ।

অচিন্ত্যশ্চ চ কত্বুর্ভূমপ্যচিন্ত্যং কিমুচ্যতে ॥ ১১৭

১১৭। আকাশও অচেষ্ট বলিয়া ঈশ্বর নহে। আত্মাও পূৰ্বে নিরস্ত হওয়াতে ঈশ্বর নহে। যদি বল ঈশ্বর অচিন্ত্য, তাহা হইলে বলি সেই অচিন্ত্য পদার্থের কত্বুর্ভূতও অচিন্ত্য, অতএব অবাচ্য। তথাপি তাহা বল কেন? (বৌদ্ধেরাও বলেন “প্রতীত্যসমুৎপাদশ্চ অচিন্ত্যত্বাং” প্রতীত্য সমুৎপাদ অচিন্ত্য হইলেও যেমন তৎসম্বন্ধে বৌদ্ধদের বহু বক্তব্য আছে, ঈশ্বরবাদীদেরও সেইরূপ)।

তেন কিং স্রষ্টুর্মিষ্টংচ আত্মা চেৎ নব্বসৌ ধ্রুবঃ !

স্মাদি স্বভাব ঈশশ্চ জ্ঞানং জ্ঞেয়াদনাদি চ ॥ ১১৮

কস্মিৎ সুখদুঃখে চ বদ কিং তেন নিৰ্মিতং ।

হেতোরাদি ন চেদন্তি ফলস্যাদিঃ কুতো ভবেৎ ॥ ১১৯

১১৮। ১১৯। ঈশ্বর কি সৃষ্টি করিতে অভিপ্রায় করেন? যদি বল আত্মাকে—কিন্তু তাহাও স্থায়ীতে ধ্রুব। পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্ ও মন ইহাদের স্বভাব, ঈশ্বর এবং (অনাদি) জ্ঞেয় হইতে উৎপাদ্যমান জ্ঞান ইহা সব অনাদি, আর কস্মিৎ হইতেই সুখ ও দুঃখ হয়, অতএব বল ঈশ্বর কি নির্মাণ করিয়াছেন?

যদি হেতুর আদি না থাকে তবে ফলের আদি কিরূপে থাকিবে?

কস্মাৎ সদা ন কুরুতে নহি সোহন্যমপেক্ষতে ।

তেনাকুতোহন্তো নান্ত্যেব তেনাসৌ কিমপেক্ষতাং ॥ ১২০

১২০। ঈশ্বর সর্বদা কেন সমস্তই করেন না? কারণ (তোমাদের

মতে) তিনি ত অত্র কিছুর অপেক্ষা করেন না অতএব অমুক কারণের অপেক্ষায় তিনি ইহা করেন না একরূপ বলিতে পার না) । ঈশ্বর করেন নাই একরূপ যখন কিছু নাই তখন তিনি কিসের অপেক্ষা করিবেন ?

অপেক্ষতে চেৎ সামগ্রীং হেতু ন পুনরীশ্বরঃ ।

নাকর্তৃগীশঃ সামগ্র্যাং ন কর্তুং তদভাবতঃ ॥ ১২১

১২১ । (আর যদি বল ঈশ্বর নিমিত্তকারণ তাহা ছাড়া সামগ্রী বা সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ আছে তাহাতে) যদি বল তিনি সামগ্রীর বা সমবায়ের অপেক্ষা করেন তাহা হইলে ঈশ্বর (সম্পূর্ণ) হেতু নহেন । সমবায়িকারণের করণবিষয়ে তিনি সমর্থ নহেন তাহাও বলিতে পার না (সর্কশক্ত বলাতে) আবার সামগ্রীর কর্তা একরূপও বলিতে পার না কারণ (ঈশ্বর ছাড়া) তাহা নাই ।

করোত্যনিচ্ছন্নীশশ্চেৎ পরায়ত্তঃ প্রসজ্যতে ।

ইচ্ছন্নপীচ্ছায়ত্তঃ স্যাৎ কুর্কতঃ কুত ঈশতা ॥ ১২২

১২২ । সমবায়ি কারণ থাকিলে তবে ঈশ্বর কর্তা ইহা ধরিলে বলিতে হইবে সেই কারণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঈশ্বর কার্য্য করেন । সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে কার্য্য করিতে হয় অতএব তিনি পরায়ত্ত । স্বেচ্ছায় কার্য্য করিলেও তিনি ইচ্ছার আয়ত্ত । অতএব এইরূপে যিনি কার্য্য করেন তাঁহার ঈশ্বরতা কোথায় ? (জগৎকর্তা সগুণ ঈশ্বর ইচ্ছাবান্ পুরুষ । তিনি স্বেচ্ছায় করেন । স্বেচ্ছায় করাকে 'ইচ্ছায়ত্ত' বলিলে তাদৃশ ইচ্ছায়ত্ততা দোষাবহ নহে) ।

যেহপি নিত্যানুনাহ স্তেহপি পূর্ব্বং নিবারিতাঃ ।

সাংখ্যাঃ প্রধান মিচ্ছন্তি নিত্যং লোকস্য কারণং ॥ ১২৩

১২৩ । (নিত্যপরমাণুবাদী মীমাংসকাদি মতও অতঃপর নিরাকৃত হইতেছে)—যাঁহারা পরমাণুসকলকে নিত্য বলেন তাঁহাদের মত ত পূর্ব্ব

নিবারিত হইয়াছে (৯৮৭ দ্রষ্টব্য)। আর সাংখ্যেরা নিত্য প্রধানকে লোকের কারণ বলেন।

সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণা অবিষমস্থিতাঃ ।

প্রধানমিতি কথ্যন্তে বিষমৈর্জগদ্ভ্যতে ॥ ১২৪

১২৪। সত্ত্ব, রজ ও তম অবিষমভাবে স্থিত এই তিন গুণকে প্রধান বলা যায়। তাহাদের বৈষম্যই জগৎ।

একস্য ত্রিস্বভাবত্বমযুক্তং তেন নাস্তি তৎ ।

এবং গুণা ন বিদন্তে প্রত্যেকং ত্বেহপি হি ত্রিধা ॥ ১২৫

১২৫। একের ত্রিস্বভাব অযুক্ত (কেন অব্যক্ত তাহা বৌদ্ধদের গ্রন্থে নাই) সূত্রাং তাহা (প্রধান) নাই। (যদি বল যে ত্রিগুণাত্মকত্বরূপ এক স্বভাব না থাকুক, ত্রিস্বভাব তিন গুণ আছে) তাহাও নহে কারণ তাহারা প্রত্যেকে ত্রিধা। অর্থাৎ সাংখ্যেরা বলেন যে সমস্ত ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্বাদিরাও সমস্তের অন্তর্গত সূত্রাং সত্ত্ব বা রজ বা তম প্রত্যেকে ত্রিগুণাত্মক। (ইহা অবশ্য বালোচিত যুক্তি। সাংখ্যেরা গুণ সকলকে ত্রিগুণাত্মক বলেন না গুণবিকার দ্রব্যকে তাহা বলেন। একই দ্রব্যের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও হৌল্য এই ত্রিস্বভাব, অগ্নির দহন প্রকাশাদি স্বভাব প্রভৃতি উদাহরণ)।

গুণাভাবে চ শব্দাদেরস্তিত্বমতি দূরতঃ ।

অচেতনে চ বজ্রাদৌ সূখাদেরপ্যসংভবঃ ॥ ১২৬

১২৬। এইরূপে গুণের অভাবে শব্দাদির অস্তিত্বও অতিদূর। আর অচেতন ত্রিগুণাত্মক বজ্রাদিতে গুণধর্ম সূখাদিও অসম্ভব। (ইহার উল্টা যুক্তি সত্য। তাহা যথা শব্দাদি সং, তাহারা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-স্বভাব অতএব তাহারা ত্রিগুণাত্মক সং। আর সাংখ্যেরা বলেন গ্রহণেই [মনে] প্রকাশাদি [সূখাদি] গুণধর্ম, কিন্তু গ্রাহে [বজ্রাদিতে] প্রকাশাদি [সূখকরত্বাদি] ধর্ম)।

তদ্বৈতরূপা ভাবাশ্চেন্নু ভাবা বিচারিতাঃ ।

সুখাদ্যেব চ তে হেতু ন' চ তস্মাৎ পটাদয়ঃ ॥ ১২৭

১২৭ । যদি বল যে ভাব সকল সুখাদির হেতু, কিন্তু তাহা নহে । কারণ ভাব সকল মায়ার মত নিঃস্বভাব বলিয়া বিচারিত হইয়াছে । (এখানেও যুক্তি দোষ । সুখাদিও ময়া বজ্রাদিও ময়া অতএব বজ্রাদি হইতে সুখাদি হইবে না কেন ?) তোমাদের (সাংখ্যের) মতে সুখাদিই পটাদির হেতু অতএব পটাদি সুখাদির হেতু নহে ।

(সাংখ্যেরা ত্রিগুণকেই হেতু বলেন ; গ্রহণগত অন্ততম ত্রিগুণধর্ম সুখকে বা দুঃখকে পটাদির হেতু বলেন না । সুখ সত্ত্বপ্রধান ত্রিগুণধর্ম) ।

পটাদেষু সুখাদি স্যাৎতদভাবাৎ সুখাদ্যসৎ ।

সুখাদীনাং চ নিত্যত্বং কদাচিন্নোপলভ্যতে ॥ ১২৮

১২৮ । পটাদি হইতে সুখাদি যদি হয় তবে পটাদির অভাবে সুখাদি অসৎ অতএব সুখাদির নিত্যত্ব কদাপি উপলব্ধ হয় না । (সুখাদি 'অসৎ' নহে কিন্তু বিকারী । সত্ত্বাদি গুণই নিত্য কিন্তু প্রত্যেক গুণবিকার নিত্য নহে । তাহারা আগমাপায়ী । তাহারা ভাবান্তর প্রাপ্ত হয় কদাপি অসৎ হয় না) ।

সত্যামেব সুখব্যক্তৌ সংবিদ্ধিঃ কিং ন গৃহ্যতে ।

তদেব সূক্ষ্মতাং যাতি সূক্ষ্মং সূক্ষ্মং চ তৎ কথং ॥ ১২৯

১২৯ । যদি সুখব্যক্তি সত্য হয় তবে সুখসংবেদন সর্বদা হয় না কেন ? যদি বল তাহা তখন সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া গৃহীত হয় না, তবে বলি তাহা সূক্ষ্ম হইলে পুনঃ সূক্ষ্ম হইবে কিরূপে ? কারণ নিত্যত্বহেতু এক বস্তুর নানা স্বভাব যুক্তিযুক্ত নহে । (ইহাও অসার আপত্তি । গুণসকল পরিণামি-নিত্য । এক ধর্ম ব্যক্ত হয় আব এক ধর্ম অব্যক্ত হয় এইরূপ যে বিকার বা পরিণাম তাহার প্রবাহই নিত্য । ভাবসকল ত্রিস্বভাব বলিয়া পর্যায়-ক্রমে এক স্বভাবের উদারভাব ও অপরের সূক্ষ্মভাব বা লয় হয় । তাহাই

বিকার । জগৎ বিকারী তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ অতএব তাহার মূলও বিকারী ।
একস্বভাব নিত্যপদার্থ মূল হইলে জগৎ বিকারী হইত না) ।

শৌল্যং ত্যক্ত্বা ভবেৎ সূক্ষ্মম্ অনিত্যে শৌল্যসূক্ষ্মতে ।

সর্বস্য বস্তুনস্তদ্বৎ কিং নানিত্যত্বমিচ্ছতে ॥ ১৩০

১৩০ । স্থূলতা ত্যাগ করিয়া যখন ভাবসকল সূক্ষ্ম হয় (বল), তখন
(বলি) স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা অনিত্য, সর্ববস্তুরও কি সেইরূপ অনিত্যতা
তোমাদের (সাংখ্যদের) ইষ্ট হওয়া উচিত নহে ? (মূল কারণ প্রধান
ছাড়া সমস্ত কার্যই সাংখ্যমতে অনিত্য, কার্যেরাই স্থূলসূক্ষ্মরূপে ভাবাস্তুর
প্রাপ্ত হয়) ।

ন শৌল্যং চেৎ সুখাদন্ত্যৎ সুখস্যানিত্যতা স্ফুটং ।

নাসত্বৎপত্নতে কিঞ্চিদসত্বাদিতি চেন্নতং ॥ ১৩১

১৩১ । শৌল্য যদি সুখ হইতে ভিন্ন না হয় তাহা হইলে শৌল্যের
নিবৃত্তি হইলে সুখেরও নিবৃত্তি হইবে স্তত্রাং সুখ স্পষ্টত অনিত্য হইবে ।
(ইহা দোষ নহে কারণ অনিত্য অর্থে অভাব নহে) । আর অবিদ্যমানতা-
হেতু কোন অসৎ পদার্থ উৎপন্ন হয় না ইহা যদি আপনাদের মত
হয় তবে—

ব্যক্তস্যাসত উৎপত্তিরকামস্যাপি তে স্থিতা ।

অন্যাদোহমেধ্যভক্ষঃ স্যাৎ ফলং হেতৌ যদি স্থিতং ॥ ১৩২

১৩২ । অসৎ ব্যক্তের উৎপত্তি হয় ইহা ইচ্ছা না করিলেও আপনাদের
মতে উহা আসিয়া পড়িতেছে । পরঞ্চ ফল যদি হেতুতে থাকে তবে অন্ন-
ভোজী অমেধ্যভোজী হইবে । (ইহা এবং বক্ষ্যমাণ উদাহরণ বালোচিত
আপত্তি । অসৎ ব্যক্ত উৎপন্ন হয় না ; উৎপন্ন ভাবের সাধারণ নামমাত্র
'ব্যক্ত' । যাহা উৎপন্ন হয় তাহা পূর্বে সূক্ষ্মরূপে থাকে । নিমিত্তের দ্বারা
উপাদান পরিবর্তিত হইলে কার্য হয় । অন্ন শরীরস্থ নিমিত্তের যোগে
তবে অমেধ্য হয় অমনি হয় না) ।

পটার্ঘেণৈব কর্পাসবীজং ক্রীড়া নিবস্যাতাং ।

মোহাচ্ছেনেক্ষতে লোকঃ তত্ত্বজ্ঞস্যাপি সা স্থিতিঃ । ১৩৩

১৩৩ । (কিঞ্চ কারণে কার্য্য থাকিলে) বস্ত্রের মূল্যে কার্পাসবীজ ক্রয় করিয়া তাহাই পরিধান করুন । যদি বলেন যে মোহবশে লোকে কারণে কার্য্যের স্ফূর্ত্তাবস্থা দেখিতে পায় না, তাহাও ঠিক নহে কারণ তত্ত্বজ্ঞেরাও তাহা দেখিতে পান না । অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞেরাও মৃত্তিকা না খাইয়া অন্ন খান, কার্পাসবীজ পরিধান না করিয়া কার্পাসবস্ত্রই পরিধান করেন । (সাংখ্যেরাও বলিতে পারেন যে স্ফূর্ত্তদর্শী অহঁতেরা চিবাইয়া শূন্য খান না, কিন্তু প্রণীত (মিষ্ট) খাদনীয় ও ভোজনীয়ের দিকেই ঝাঁকেন । কিঞ্চ লোকে বস্ত্রের মূল্যের অর্দ্ধাপেক্ষা কমমূল্যে কার্পাসবীজ ক্রয় করিয়া বপন চয়ন বয়নাদি নিমিত্তে বস্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া তবে পরিধান করে । কার্পাস বীজ যে বস্ত্রের একমাত্র কারণ তাহা উন্মাদেও বলে না) ।

লোকস্তাপি চ তজ্জ্ঞানমস্তি কস্মিন্ন পশ্চতি ।

লোকাপ্রমাণতায়াং চেদ্ ব্যক্তদর্শনমপ্যসৎ ॥ ১৩৪

১৩৪ । সাধারণ লোকেরও সেই জ্ঞান আছে অতএব তাহারাই বা কেন কারণে কার্য্য দেখিতে পায় না । যদি বল লোকদের দৃষ্টি অপ্রামাণিক তবে ব্যক্তের দর্শনও (যাহা লোকগোচর) অসৎ ।

(উত্তরে সাংখ্যেরা বলিতে পারেন যে লোকদেরও শূন্যতাজ্ঞান আছে তবে তাহারা জগৎকে শূন্য দেখেনা কেন ? ফলত তত্ত্বজ্ঞান দ্বিবিধ, আনুমানিক এবং যোগজ সাক্ষাৎকার । অনুমানের দ্বারা সামান্যত সকলেই ঐ সূত্র্য জানিতে পারে । যোগীরাই উহা সাক্ষাৎকার করিয়া কারণকার্য্যক্রমে ত্রিকালের জ্ঞানলাভ করেন ।

বৌদ্ধেরাও ত্রিকালজ্ঞান স্বীকার করেন কিন্তু তাহা কিরূপে হয় বুঝাইতে পারেন না । সংকার্য্যবাদের দ্বারাই উহা বুঝা যায় । ‘অপ্রমাণ’ ও ‘অসৎ’ এই দুই শব্দ একার্থক ধরিয়া এই স্থলে ত্রায়াভাস সৃষ্ট হইয়াছে ।

অপ্রমাণ অর্থে এস্থলে মিথ্যাজ্ঞান বা উন্টাজ্ঞান আর অসৎ অর্থে অভাব ।
লোকদের দর্শন ভ্রান্ত তাহা সত্য, ব্যক্তদর্শনও তাদৃশ মিথ্যাজ্ঞান—অসৎ
নহে—তাহা সাংখ্যসম্মত) ।

প্রমাণমপ্রমাণং চেৎ ননু তৎ প্রমিতং মৃষা ।

তত্ত্বতঃ শূন্যতা তস্মাদ্ভাবানাং নোপপত্ততে ॥ ১৩৫

১৩৫ । সাংখ্যেরা সিদ্ধান্তবাদীদের (বৌদ্ধদের) মতে এইরূপ দোষ
দেন—যদি আপনাদের মতে প্রমাণ অপ্রমাণ হয় (মায়াত্মক বলিয়া) তবে
প্রমাণের দ্বারা প্রমিত বিষয় মিথ্যা হইবে । তাহাতে আপনারা যে ভাব-
পদার্থে শূন্যতা প্রমাণ করেন তাহাও অলীক কথা হইবে ।

কল্পিতং ভাবমস্পৃষ্টা তদভাবো ন গৃহ্যতে ।

তস্মাদ্ভাবো মৃষা যোহি তস্যাভাবঃ স্ফুটং মৃষা ॥ ১৩৬

১৩৬ । উক্ত দোষের পরিহার করিতেছেন—কল্পিত এক ভাব পদার্থ
গ্রহণ না করিয়া তাহার অভাব গৃহীত হয় না । অতএব ভাবটা যদি
মিথ্যা হয় তবে তাহার অভাব স্পষ্টতই মিথ্যা ।

(উত্তরটা অসার, কারণ ভাবপদার্থ কল্পনা করিয়া জানা যায় না কিন্তু
প্রত্যক্ষত জানা যায় ; আর অভাব পদার্থ সর্বথা কাল্পনিক । আর প্রমাণই
বখন নাই তখন ‘ভাবোমৃষা’ ইহাই বা কিরূপে প্রমাণ কর) ?

তস্মাৎস্বপ্নে স্মৃতে নষ্টে সো ধাস্তীতি বিকল্পনা ।

তদ্ভাবকল্পনোৎপাদং বিব্রাতি মৃষা চ সা ॥ ১৩৭

১৩৭ । অতএব স্বপ্নে পুত্র নষ্ট হইলে ‘সে নাই’ এরূপ যে বিকল্পনা
হয় তাহাতে সেই পুত্রের অস্তিত্বকল্পনার উৎপাদ নিষিদ্ধ হইলেও সেই
ভাবাভাব কল্পনা সবই মিথ্যা ।

(কাল্পনিক বিষয় মিথ্যা—অসৎ নহে—হইতে পারে, কিন্তু কল্পনাশক্তিটা
কি ? তাহা অসতী অথচ তদ্বারা সমস্ত হয় । আর মিথ্যা থাকিলে
সত্যও আছে । সত্য কি ? তাহা কিসের দ্বারা জানা যায় ? মিথ্যাকল্প-

নার দ্বারাও এতন্মতে সত্য জানা যাইবে ইত্যাদি নানা ছায়দোষের প্রসঙ্গ হয় ; বৌদ্ধেরা তাহার উত্তর দিতে পারেন না) ।

তস্মাদেবং বিচারেণ নাস্তি কিঞ্চিদহেতুতঃ ।

ন চ ব্যস্তসমস্তেষু প্রত্যয়েষু ব্যবস্থিতং ॥ ১৩৮

১৩৮ । অতএব এইরূপ বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে কিছুই অহেতুতে নাই । আর ব্যস্ত (স্বত অথবা পরত) বা সমস্তে (স্বতপরত দুই মিলিয়া) কোনরূপে বস্তুর উৎপাদ ব্যবস্থিত বা প্রতিষ্ঠিত নহে ।

অন্যতো নাপি চায়াতং ন তিষ্ঠতি ন গচ্ছতি ।

মায়াতঃ কো বিশেষোহস্য যন্মূঢ়ৈঃ সত্যতঃ কৃতং ॥ ১৩৯

১৩৯ । কোন পদার্থ অন্য কিছু হইতে আসেনা, তাহার খাকেও না যায়ও না । ইহা সব মায়ী ছাড়া আর কিছু নহে । মূঢ়েরাই ইহাকে সত্য করিয়াছে । (কিন্তু মায়ী অগত্যা আছে বা সত্য) ।

মায়য়া নিশ্চিতং যচ্চ হেতুভির্যচ্চ নিশ্চিতং ।

আয়াতি তৎ কুতঃ কুত্র যাতি চেতি নিরূপ্যতাং ॥ ১৪০

১৪০ । যাহা মায়ার দ্বারা নিশ্চিত এবং যাহা হেতুর দ্বারা নিশ্চিত তাহা কোথা হইতে আসে কোথায়ই বা যায় নিরূপণ করুন ।

যদন্তসংনিধানেন দৃষ্টং ন তদভাবতঃ ।

প্রতিবিশ্বসমে তস্মিন্ কৃত্রিমে সত্যতা কথং ॥ ১৪১

১৪১ । যে বস্তুরূপ অন্নের (হেতুর) সন্নিধানের দ্বারা দৃষ্ট হয় কিন্তু অন্নের অভাবে দৃষ্ট হয় না তাহা পরাধীন বৃত্তি বলিয়া প্রতিবিশ্বের মত কৃত্রিম । তাহার সত্যতা কোথায় ?

বিগ্ধমানস্য ভাবস্য হেতুনা কিং প্রয়োজনম্ ।

অথাপ্যবিগ্ধমানোহসৌ হেতুনা কিং প্রয়োজনম্ ॥ ১৪২

১৪২ । বিগ্ধমান ভাবের হেতুতে কি প্রয়োজন আর উহা অবিগ্ধমান হইলেই বা হেতুতে কি প্রয়োজন ?

নাভাবস্য বিকারোহস্তি হেতুকোটিশতৈরপি ।

তদবস্থঃ কথংভাবঃ কো বাণ্ডো ভাবতাং গতঃ ॥ ১৪৩

১৪৩ । শতকোটি হেতুর দ্বারাও অভাবের বিকার হয় না অতএব অভাবের বিকারাবস্থা কিরূপে ভাব হইবে? অথ বা কি ভাবত প্রাপ্ত হইবে?

নাভাবকালে ভাবশেচৎ কদা ভাবো ভবিষ্যতি ।

নাজাতেন হি ভাবেন সোহভাবোহপগমিষ্যতি ॥ ১৪৪

১৪৪ । অভাবকালে যদি ভাব না থাকে তবে ভাব কবে হইবে। যাবৎ ভাব না হয় তাবৎ অভাবের অপগম হয় না।

ন চানপগতেহভাবে ভাবাবসরসম্ভবঃ ।

ভাবশ্চাভাবতাং নৈতি দ্বিস্বভাবপ্রসঙ্গতঃ ॥ ১৪৫

১৪৫ । অভাব অপগত না হইলে ভাবাবসর সম্ভব হয় না। ভাবও কখনও অভাবতা প্রাপ্ত হয় না যেহেতু তাহাতে দ্বি-স্বভাবের প্রসঙ্গ হয়।

(এই সকল শব্দমাত্রময় হেতুভাস সৃষ্টি করিয়া জগৎ নাই প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে। ভাধি অর্থে যাহা আছে; অভাব অর্থে যাহা নাই। স্মুতরাং সংভাব, অসংভাব, সংঅভাব, অসং অভাব ইত্যাদি প্রয়োগ ব্যর্থ শব্দাভিধির মাত্র) ।

এবং চ ন নিরোধোহস্তি ন চ ভাবোহস্তি সর্বদা ।

অজাতমনিরুদ্ধং চ তস্মাৎ সর্বমিদং জগৎ ॥ ১৪৬

১৪৬ । এইরূপে বিনাশ নাই এবং বস্তুর সত্তাও নাই। এই সমস্ত জগৎ জন্মায় নাই এবং নাশও হয় নাই।

(এই প্রাচীনতর মায়াবাদ বর্তমান মায়াবাদের মূল। সেইজন্ত মায়াবাদীদের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। আধুনিক মায়াবাদীরাও এইরূপ উপায়েই জগৎ নাই প্রমাণ করিতে যান) ।

স্বপ্নোপমান্ত গত্যো বিচারে কদলীসমাঃ ।

নির্বৃত্তানির্বৃত্তানাং চ বিশেষো নাস্তি বস্তুতঃ ॥ ১৪৭

১৪৭ । দেবমনুষ্যাদি লোকে যে গতি হয় তাহা স্বপ্নোপম । তাহা বিচার করিলে কদলীকাণ্ডের ত্রায় নিঃসার হয় । মুক্ত ও বন্ধদের বস্তুত প্রভেদ নাই ।

(বস্তুই যখন নাই তখন ‘বস্তুত’ কাহাকে বলা যাইবে? আর্ষ-দার্শনিকেরাও এইরূপ বলেন বটে কিন্তু তাহা মুক্তস্বভাব পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া । “বন্ধ মোক্ষৌ কুতো মে” ইত্যাদি বৈদান্তিকের গাথা দ্রষ্টব্য) ।

এবং শূন্যে ধর্মেষু কিং লব্ধং কিং হতং ভবেৎ ।

সংকৃতঃ পরিভূতো বা কেন কঃ সংভবিষ্যতি ॥ ১৪৮

কুতঃ সুখং বা দুঃখং বা কিং প্রিয়ং বা কিমপ্রিয়ম্ ।

কা তৃষ্ণা কুত্র সা তৃষ্ণা মৃগ্যমাণা স্বভাবতঃ ॥ ১৪৯

বিচারে জীবলোকঃ কঃ কো নামাত্র মরিষ্যতি ।

কো ভবিষ্যতি কো ভূতঃ কো বন্ধুঃ কশ্চ কঃ সুহৃৎ ॥ ১৫০

১৪৮—৫০ । এইরূপে ধর্মসকল শূন্য প্রতিপন্ন হওয়াতে—কি লব্ধ কি বা হত হয়? কাহার দ্বারা কে সংকৃত বা পরিভূত হয়? সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় কোথায়? স্বভাব ধরিয়া অন্বেষণ করিলে তৃষ্ণা কি হয় বা কোথায় থাকে? বিচার করিয়া দেখিলে জীবলোক কি? কেই বা এখানে মরে, কেই বা হয়, কেই বা হইয়াছিল, কে বা বন্ধু আর কেবা কাহার সুহৃৎ?

(বৌদ্ধেরা যে দৃষ্টি হইতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হউন না কেন ইহা সর্বথা সত্য এবং সমস্ত মোক্ষদার্শনিকদের অভিমত । বৈদান্তিকেরা জগৎকে মায়াময় বলেন, সাংখ্যেরাও বলেন যে মূল কারণ অব্যক্ত অদর্শনীয়, যাহা দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত হয় তাহা মায়া মত তুচ্ছ) ।

সর্বমাকালসংকালং পরিগৃহুস্ত মদ্বিধাঃ ।

প্রকুপ্যন্তি প্রহস্যন্তি কলহোৎসবহেতুভিঃ ॥ ১৫১

১৫১। এই সমস্তই আকাশকল্প, আমাদের মত মূঢ় জনেরাই ইহাতে স্বরূপ আরোপ করিয়া গ্রহণ করে এবং কলহে প্রকুপিত ও উৎসবে প্রহৃষ্ট হয়।

শোকায়াসৈবিষাদৈশ্চ মিথশ্ছেদনভেদনৈঃ ।

যাপয়ন্তি স্কন্ধেণ পাপৈরাশ্মসুখেচ্ছবঃ ॥ ১৫২

১৫২। আশ্মসুখেচ্ছু জনেরা শোক, আয়াস ও বিষাদ এবং পরস্পর ছেদন ভেদনরূপ পাপে অতি কষ্টে কাল কাটায়।

মৃত্যুঃ পতন্ত্যপায়েষু দীর্ঘতীব্রব্যথেষু চ ।

আগত্যাগত্য স্মৃগতিং ভূত্বা ভূত্বা সুখোচিতাঃ ॥ ১৫৩

১৫৩। মৃত হইয়া তাহারা দীর্ঘকাল তীব্রব্যথাদায়ী নরকে গতিত হয়, অথবা সুখকর স্মৃগতি প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে থাকে।

ভবে বহুপ্রপাতশ্চ তত্র চাসঙ্কমীদৃশম্ ।

তত্রাত্তোত্ত্বিরোধশ্চ ন ভবেত্তত্ত্বমীদৃশম্ ॥ ১৫৪

১৫৪। সংসারে বহুবিধ প্রপাত বা উপঘাত আছে এবং উক্তরূপ অসঙ্ক বা অতঙ্ক আছে। আর তাহাতে অত্তোত্ত্বিরোধ আছে এবং ঈদৃশ তত্ত্বও তাহার নহে (এতাদৃশ বস্তুতে অনেকাকার সমারোপিত হয় বলিয়া)।

তত্র চানুপমাস্তীত্রা অনন্তদুঃখসাগরাঃ ।

তত্রৈবমল্লবলতা তত্রাপ্যল্লভ্যমায়ুষঃ ॥ ১৫৫

তত্রাপি জীবিতারোগ্যব্যাপারৈঃ ক্ষুৎক্রমশ্রমৈঃ ।

নিদ্রয়োপদ্রবৈর্বালসংসর্গৈঃ নিফলৈস্তথা ॥ ১৫৬

বৃথৈবায়ুবহত্যাশু বিবেকস্ত স্কুলভঃ ।

তত্রাপ্যভ্যস্তবিক্ষেপনিবারণগতিঃ কুতঃ ॥ ১৫৭

১৫৫—৫৭। আর সংসারে অনুপম, তীব্র, অনন্ত দুঃখ সাগর আছে এবং হীনবীর্যতা ও অল্লায়ুষ্কতাও আছে। আর তাহাতে জীবন ও আরোগ্যের চেষ্টায় ক্ষুধা, ক্লান্তি, শ্রমে ও নিদ্রায়, উপদ্রবে, নিফল বালসংসর্গে

আয়ু বৃথা ও শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায় । বিবেক এই সংসারে সুহৃৎ ; আর সংসারে পূর্ক্কাভ্যস্ত অশৈখ্যের নিবারণ করার উপায়াবলম্বন কোথায় ?

তত্রাপি মারো যততে মহাপায়প্রপাতনে ।

তত্রাসন্ন্যাস-বাহুল্যাধিচিকিৎসা চ দুর্জয়া ॥ ১৫৮

১৫৮ । আর তাহাতে (সংসারে) মার মহাদুর্গতিতে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তথায় বহুবিধ অসংমার্গ থাকাতে দুর্জয়া বিচিকিৎসা বা সংশয় আছে ।

পুনশ্চ ক্ষণদৌলভ্যং বুদ্ধোৎপাদোহতিহৃৎ ।

ক্লেশৌষো দুর্নিবারশ্চেত্যহো দুঃখপরম্পরা ॥ ১৫৯

১৫৯ । আর সংসারে কথঞ্চিৎ সুগতি প্রাপ্ত হইলেও অষ্টবিধ ক্ষণ-সম্পদ হৃৎ, বুদ্ধোৎপাদও অতি হৃৎ । তাহাতে দুর্নিবার ক্লেশরাশি আছে অতএব অহো ! সংসারে কেবল দুঃখের অবিরল প্রবাহ ।

অহো বতাতিশোচ্যত্বমেবাং দুঃখৌষবর্তিনাম্ ।

যে নেক্ষন্তে স্বদৌঃস্থিত্যমেবমপ্যতিদুঃস্থিতাঃ ॥ ১৬০

১৬০ । অহো ! এই দুঃখশ্রোতে নিমগ্ন প্রাণীদের অবস্থা অতি শোচনীয় । তাহারা এইরূপে অতিশয় দুঃস্থিত হইয়াও নিজেদের দৌঃস্থিত্য বুঝিতে পারে না ।

স্নাত্বা স্নাত্বা যথা কশ্চিদ্ধিশেদহিং মুহুমুহঃ ।

স্বসৌস্থিত্যং চ মন্তস্ত এবমপ্যতিদুঃস্থিতাঃ ॥ ১৬১

১৬১ । কোনও উপহতবুদ্ধি ব্যক্তি যদি পুনঃ পুনঃ স্নান করিয়া (শীতের জন্ত) মুহুমুহ অগ্নিতে প্রবেশ করে সেইরূপ সত্ত্বেরাও অতিদুঃস্থিত হইয়াও নিজের সৌস্থিত্য কল্পনা করে ।

অজরামরলীলানামেবং বিহরতাং সতাং ।

আয়াস্যন্ত্যাপদো ঘোরাঃ কৃত্বা মরণমগ্রতঃ ॥ ১৬২

১৬২। অজর অমরের মত লীলা বা চেষ্টা করিয়া নিশ্চিতভাবে বিহরণ-কারী প্রাণীদের মরণকে সম্মুখে করিয়া ঘোর আপদ সকল উপস্থিত হয়।

এবং দুঃখাগ্নিতপ্তানাং শান্তিঃ কুর্যামহং কদা।

পুণ্যমেঘসমুদ্ভূতৈঃ সুখোপকরণৈঃ স্বকৈঃ ॥ ১৬৩

১৬৩। নিজের পুণ্যরাশিসমুদ্ভূত সুখকর উপকরণের দ্বারা এইরূপে? দুঃখাগ্নিতপ্ত প্রাণীদের কবে আমি (বুদ্ধ হইয়া) শান্তিবিধান করিব ?

কদোপলন্তদৃষ্টিভ্যো দেশয়িষ্যামি শূন্যতাম্।

সংবৃত্যানুপলন্তেন পুণ্যসংভারমাদরাৎ ॥ ১৬৬

১৬৪। কবে উপলন্তদৃষ্টিতে বা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া (ব্যবহারদৃষ্টি আশ্রয় করিয়া নহে) শূন্যতার উপদেশ করিব ? আর কবে অনুপলন্তপূর্বক (দেয়, দায়ক ও প্রতিগ্রাহক এই তিন ভাব ত্যাগ করিয়া) সমৎকারে পুণ্যসংভারের উপদেশ করিব ?

উপসংহারে ব্যবহারদৃষ্টি ও পারমার্থিক দৃষ্টি বিচার্য। ব্যবহার ও পরমার্থ এই দুই শব্দের অর্থ লইয়া অনেক গোল হয় এবং ঐ দুই পদের অনেক দার্শনিক অপব্যবহার হয়। ব্যবহার দৃষ্টি অর্থে সাধারণত আমরা অন্তর্বাহ্য বিষয় যেকোন জ্ঞানি এবং যে অর্থে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করি। পরমার্থ অর্থে পরম প্রয়োজন যে মোক্ষ তাহা। তদর্থে যাহা জ্ঞেয় ও কার্য্য তদ্বিষয়ক জ্ঞানই পরমার্থ দৃষ্টি। পরমার্থ বিবয়ের যথার্থ জ্ঞান পরমার্থ সত্যজ্ঞান, আর ব্যবহার বিষয় লইয়া বা তাহাকে ভিত্তি করিয়া পরমার্থ সত্যে আমরা উপনীত হই।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে পরমার্থ দৃষ্টি ও পরমার্থ সিদ্ধি—এই দুইটি পৃথক পদার্থ। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে পরমার্থসিদ্ধি হয়। সুতরাং তখন বাক্য ও মনের নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ তখন কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, কথাও থাকে না, অতএব সত্যমিথ্যা আদি কোনও পদার্থের দৃষ্টি থাকে

না। আর পরমার্থ দৃষ্টি অর্থে পরম অর্থসাধনের উপযোগী প্রজ্ঞা বা দর্শন। তাহাতে অবশ্য চিত্ত বা জ্ঞান-ইচ্ছাদি সব থাকে সূতরাং সত্য-মিথ্যা, ভাব-অভাব, সং-অসং, কার্য-অকার্য ইত্যাদি সব যথাযথ জানিতে ও করিতে হয়। বাদীদের কেহ বলেন এই অবস্থায় জগৎ শূন্য, কেহ বলেন তাহা মায়া; কেহ বা বলেন অব্যক্ত ত্রিগুণ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোন্টা যথার্থের বা সত্যের ভাষণ তাহাই বিচার্য।

অনেকের একরূপ দার্শনিক অপরিপাক আছে যে তাঁহারা পরমার্থ সিদ্ধি ও পরমার্থ দৃষ্টি এই দুইয়ের ভেদ করিতে না পারিয়া পরমার্থসিদ্ধিতে যাহা হয় পরমার্থদৃষ্টিতে তাহার অবতারণা করিয়া ঐ অপরিপাকের পরিচয় দেন। পরমার্থদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণের দ্বারা পদার্থ প্রমিত করিয়া চলিতে হয়, তাহাতে ‘অপ্রমেয়, অনির্বাচ্য’ ইত্যাদি কথা বলা নিতান্ত অযুক্ততা।

বৌদ্ধেরা বলেন ‘নির্বাণং শূন্যোপমং মায়োপমং তথাগতঃ শূন্যোপমঃ মায়োপমঃ’, এইরূপ কথা সর্ববাদীদের অনুমত; কারণ, সাংখ্য-বেদান্ত আদি নির্বাণবাদীরা সকলেই জগৎকে ও জাগতিক দ্রব্যকে ঐরূপ ভ্রান্তি বলেন। ঐ চরম অবস্থায় যাওয়ার জন্ত ঐ ভ্রান্তি বা অবিद्या যে ত্যাজ্য তাহাও সর্বসম্মত। ঐ পদ উপলব্ধি করার জন্ত যুক্তিযুক্ত দর্শন চাই। ‘নাসতো বিদ্বতে ভাবো নাহভাবো বিদ্বতে সতঃ’ এই সত্য স্বস্থ ও সরল ত্রায়প্রবণ-চিত্ত দার্শনিকদের মূল অবলম্ব্য তথ্য। কিন্তু শূন্যবাদীদের বলিতে হয় সত্যের মূল শূন্য, মায়াবাদীদের বলিতে হয় তাহা অনির্বাচ্য, আরম্ভবাদীদের বলিতে হয় তাহা অসং—ইত্যাকার অযুক্ত কথা বলিয়া ইহাদের অসম্যক্ পরমার্থ দর্শন খাড়া করিতে হয়।

যদি সবই শূন্য, তবে—শূন্য হুঃখের জন্ত, শূন্য দেহী সব, শূন্য চারি আর্ধ্যসত্যের প্রজ্ঞা পূর্বক শূন্য অষ্টাঙ্গিকমার্গে গমন করিয়া শূন্য নির্বাণের শূন্য লাভ করে। সেইরূপ সব মায়াময় বা মিথ্যা হইলে—মিথ্যা জীব,

মিথ্যা বেদের মিথ্যা প্রমাণে মিথ্যা কর্তব্য মিথ্যা সাধন করিয়া মিথ্যা মুক্তি লাভ করে। এরূপ 'শূন্য' ও 'মিথ্যা' পদ পরমার্থ-দর্শনে ব্যবহার করা যে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য।

ইতি কাপিলমঠাচার্যাকৃত বোধিচর্যাবতারের
নবম পরিচ্ছেদ প্রজ্ঞাপারমিতার
অনুবাদ সমাপ্ত।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

